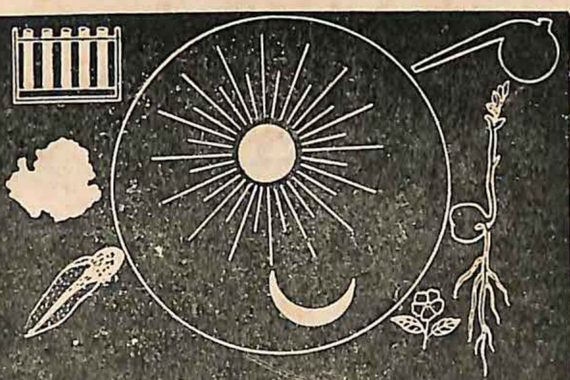
উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

Text-book on General Science for **CLASS VII** *according to the latest Syllabus of the West Bengal Board of Secondary Education for Higher Secondary, High, Junior High and Senior Basic Schools.*
[Vide Notification No. T. B./37 dated 22. 12. 69]



উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ ঃ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য
[নিম্ন-মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও উচ্চতর-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য]

পদার্থ-বিজ্ঞান, উচ্চ-মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ও চতুর্থ ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

অধ্যাপক এ. কে. ভট্টাচার্য, এম. এস-সি.

ও

এস. কে. মিত্র, বি. এস-সি., বি.টি.

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : 1969
পরিমার্জিত সংস্করণ : 1969
দাম : টা. 2·00

[অনুমোদিত সংস্করণ]

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক 9 শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা 12 হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস, 15A ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা 6 হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

1. বায়ুর ওজন আছে এবং বায়ু বল উৎপন্ন করে (Air has weight and develops force) :

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) : পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুর একটি আবরণ আছে। এই আবরণের গভীরতা 500 কিলোমিটারেরও বেশী। মাছ যেমন জলে ডুবিয়া আছে এবং জলের নীচে অবাধে বিচরণ করে, আমরাও তেমনি বায়ুর মহাসমুদ্রে ডুবিয়া আছি এবং এই বায়ুস্তরের নীচে অবাধে বিচরণ করিতেছি। আমাদের চারিদিকে সর্বত্রই বায়ু আছে। আপাতদৃষ্টিতে কোন পাত্র শূন্য বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। একটি খালি ঘটি জলে ডুবাইয়া উহাকে জলপূর্ণ করিতে গেলে শব্দ হয়। ইহার কারণ, খালি ঘটির মধ্যস্থিত বায়ু তখন ঘটি হইতে সশব্দে বাহির হইয়া আসে। ঘটির মুখে হাত দিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

পৃথিবীর চারিদিকে এই যে বায়ুর আবরণ আছে, তাহাকে এককথায় **বায়ুমণ্ডল** (atmosphere) বলে।

বায়ু আমরা চোখে দেখিতে পাই না, কিন্তু নানা প্রকারে বায়ুর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। আশ্বিনের ঝড়, বৈশাখের 'কালবৈশাখী', পাখা দ্বারা বায়ু-সঞ্চালন—এই সকল ক্ষেত্রেই বায়ুর প্রবাহ চলে এবং বায়ুতে প্রবাহ থাকিলেই আমরা বায়ুর অস্তিত্ব ভালভাবে বুঝিতে পারি।

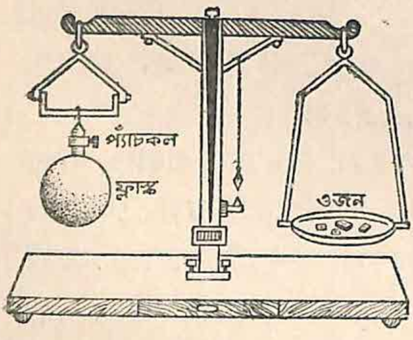
বায়ু ছাড়া কোন সাধারণ জীব এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। ইহা দ্বারা জীবের—উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্য চলে। শ্বাসকার্যের জন্য আমাদের গৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। আবার

বায়ুর অভাবে সাধারণতঃ কোন পদার্থ জ্বলিতেও পারে না। আমরা বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে নৌকা চালাই, ঘুড়ি উড়াই।

বায়ুর ওজন আছে (Air has weight) : সকল জড় পদার্থেরই ওজন আছে। বায়ু একটি জড় পদার্থ; সুতরাং ইহারও ওজন আছে। বায়ু অত্যন্ত হালকা বলিয়া মনে হইতে পারে যে, বায়ুর ওজন নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। বায়ুর যে ওজন আছে, এখানে সেই সম্পর্কে কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলা হইল।

পরীক্ষা 1. একটি প্যাঁচকল ও একটি স্টপককযুক্ত ফ্লাস্ক লও। ইহার মুখে প্যাঁচকল ঠিকমত বসাইয়া ইহাকে ওজন কর। হুকসহ প্যাঁচকল এবং স্টপককের চাবি খুলিয়া ফ্লাস্কের মধ্য হইতে বাত-পাম্পের সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন কর। স্টপককের চাবি বন্ধ করিয়া আবার প্যাঁচকল আঁটিয়া দাও। এখন এই অবস্থায় ইহাকে ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ওজন আগের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে।

ইহাতে প্রমাণ হয় যে, **বায়ুর ওজন আছে।** ফ্লাস্কের ভিতরকার বায়ু বাহির হইবার ফলে উহার ওজন কমিয়াছে।

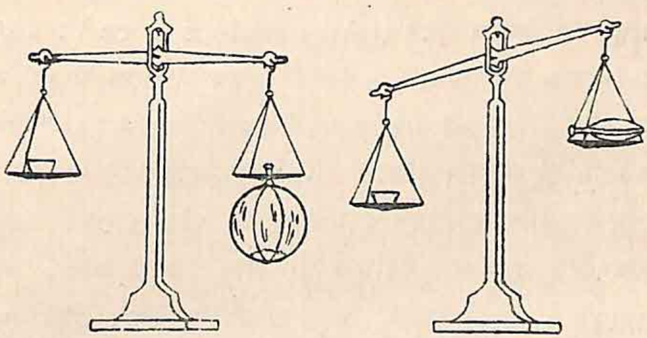


চিত্র 1. বায়ুর ওজন সম্পর্কে পরীক্ষা

এখন, প্যাঁচকল ও স্টপকক খুলিয়া দিলে বাহির হইতে বায়ু ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করিবে। আবার প্যাঁচকল (স্টপকক ফ্লাস্কের সহিত স্থায়িভাবে সংলগ্ন থাকে) আঁটিয়া উহাকে ওজন করিলে ওজন বাড়িয়া আগের মত হইবে। বাহির হইতে বায়ু ফ্লাস্কে প্রবেশ করিল বলিয়া এইবার ফ্লাস্কের ওজন বাড়িল।

বায়ুর ওজন সম্পর্কে এই পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক অটো ভন গেরিক।

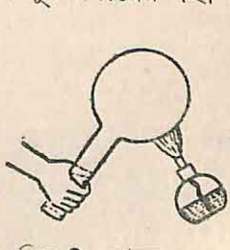
পরীক্ষা 2. তোমরা অনেকেই ফুটবল খেল। একটি ফুটবলের ব্লাডার পাম্প না করিয়া উহার স্বাভাবিক অবস্থায় ওজন কর। পরে খুব বেশী পাম্প করিয়া ব্লাডারটিকে আবার ওজন কর। দেখা যাইবে, দ্বিতীয়বারের ওজন একটু বেশী হইয়াছে।



চিত্র 2. বায়ুর ওজন সম্পর্কে পরীক্ষা

ইহার কারণ কী? পাম্প না করিলে ব্লাডারের মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণ বায়ু থাকে। পাম্প করিয়া আরও বায়ু উহাতে ঢুকাইলে উহার ওজন বাড়ে। খুব বেশী পাম্প করিলেই ওজনের এই পার্থক্য ধরা পড়িবে—অল্প পাম্প করিলে বোঝা যাইবে না।

পরীক্ষা 3. একটি গোল তলাবিশিষ্ট ফ্লাস্কের মুখ রবারের ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া ফ্লাস্কটিকে ওজন কর। পরে ছিপি খুলিয়া ফ্লাস্কের গলা ধরিয়া ফ্লাস্কটিকে চারিদিকে সমানভাবে সামান্য গরম কর। ইহাতে ফ্লাস্কের ভিতরকার অধিকাংশ বায়ু হালকা হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পরে, ফ্লাস্কটি উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে উহার মুখ পুনরায় ছিপি দিয়া বন্ধ কর। ফ্লাস্কটি শীতল হইলে উহাকে



চিত্র 3. বায়ুর ওজন সম্পর্কে পরীক্ষা

পুনরায় ওজন কর। এইবার ওজন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। ইহার কারণ, উত্তপ্ত ফ্লাস্ক হইতে কিছু বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। এই তুই ওজনের পার্থক্য হইতেছে, ফ্লাস্ক হইতে নির্গত বায়ুর ওজনের সমান। ফ্লাস্কের ছিপি খুলিলে সশব্দে বায়ু উহার ভিতরে প্রবেশ করিবে। এইবার ফ্লাস্কটি ওজন করিলে দেখা যাইবে, উহার ওজন প্রথমবারের ওজনের সমান হইয়াছে।

বায়ু বল উৎপন্ন করে (Air develops force) : বায়ু জড় পদার্থ হইলেও হালকা বলিয়া উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সর্বদা সচেতন নহি। কিন্তু এই বায়ুতে যখন প্রবাহ উপস্থিত হয় তখন উহার অস্তিত্বই যে শুধু আমরা বুঝিতে পারি তাহা নহে, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের বেগে অনেক সময় আমাদের অনেক ক্ষতিও হইয়া থাকে।

ভীষণ ঝড় প্রবল বায়ুপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নহে। ভীষণ ঝড়ে গ্রামের ঘর-বাড়ী, বড় বড় গাছ প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বায়ুতে প্রবল প্রবাহ থাকিলে উহা ভীষণ জোরে কোন জিনিসকে ধাক্কা দিতে পারে। অর্থাৎ, বায়ুতে প্রবাহ থাকিলে **বায়ুতে বলের সঞ্চার হয়।** সুতরাং কোন বস্তুর উপর বাতাস বা বা বায়ুপ্রবাহ বলপ্রয়োগ করিতে পারে।

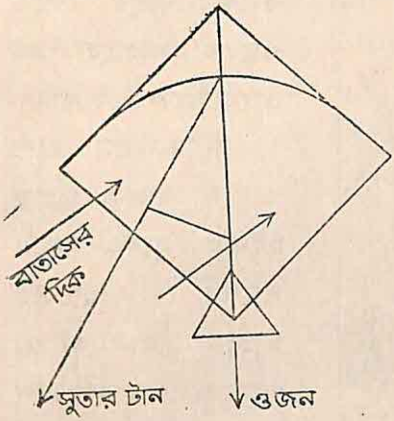
অল্প বেগে বায়ু বহিতে থাকিলে বায়ুতে সঞ্চারিত বলকে নানাভাবে আমাদের কাজে লাগান যাইতে পারে ; কিন্তু বায়ুর বেগ যদি প্রচণ্ড হয়, তবে উহাকে কাজে লাগান কঠিন।

বায়ুর বলকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাইয়া থাকি, এখানে সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে।

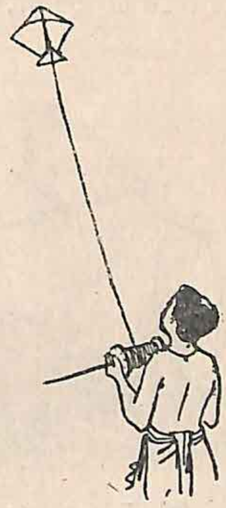
ঘুড়ি উড়ান (Kite flying) : ঘুড়ি উড়াইয়া অনেকে আনন্দ পাইয়া থাকে। ঘুড়িকে আকাশে উড়াইয়া রাখার কাজে বায়ুর বেগই সাহায্য করিয়া থাকে।

ঘুড়ির সূতায় তেরছাভাবে নীচের দিকে একটু টান পড়ে। ঘুড়ির ওজনও নীচের দিকে ক্রিয়া করে। ঘুড়ি ঠিকভাবে রাখিলে বায়ুর

বলে উহা উপরদিকে একটি ধাক্কা পায়; সেই কারণে ঘুড়ির সূতা না কাটিয়া যাওয়া পর্যন্ত ঘুড়ি আকাশে উড়িতে থাকে। অবশ্য প্রয়োজন হইলে ঘুড়িকে টানিয়া সকল সময়েই নীচে নামান যায়।



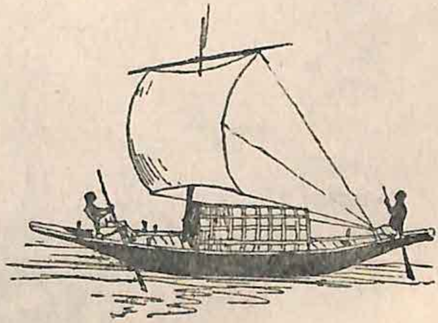
চিত্র 4. ঘুড়ি



চিত্র 5. ঘুড়ি উড়ান

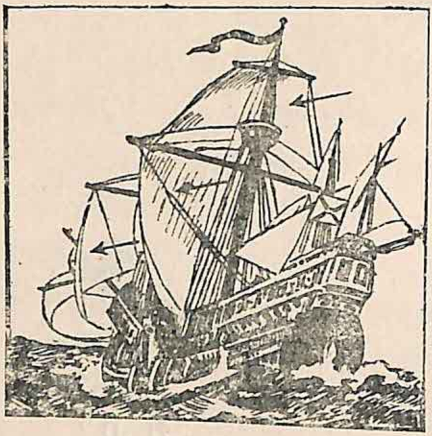
আবার বাতাসের বেগ কম-বেশি হইলে অথবা দিক পরিবর্তন হইলে ঘুড়িকে ঠিকমত উড়াইবার কৌশল জানা আবশ্যক।

পালের নৌকা (Sailing boat) : তোমরা পালের নৌকা দেখিয়াছ। একটি খুঁটির সহিত দণ্ড ও দড়ির সাহায্যে নৌকায় পাল তোলা হয়। এই পাল একখানি শক্ত কাপড় বিশেষ। যেদিকে নৌকা চলিতেছে, মোটামুটি ঐ দিকে যদি বায়ুর বেগ, অর্থাৎ বাতাস থাকে, তবে বাতাসের জোরে পালের কাপড় ফুলিয়া উঠে এবং বায়ুর বেগ পালকে ঠেলিয়া নৌকাকে সেইদিকে লইয়া চলে। ঐ সময়



চিত্র 6. পালের নৌকা

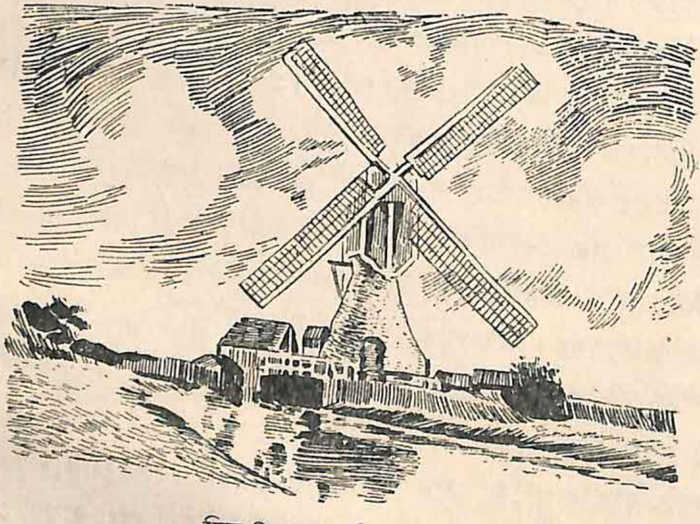
নৌকার মাঝিকে পালের কাপড় ঝুলাইবার দিক ঠিক করিয়া দিতে হয় এবং শুধু হাল ধরিয়া থাকিলেই বায়ুর বলে নৌকা সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে।



চিত্র 7. পালের জাহাজ

নৌকা চালাইবার কাজে বায়ুর বলকে পালের সাহায্যে এই ভাবে কাজে লাগান হয়।

স্টীম-ইঞ্জিন দ্বারা জাহাজ চালনা আরম্ভ হইবার পূর্বেও সমুদ্রে পালের সাহায্যেই জাহাজ চালান হইত। পালতোলা জাহাজগুলি বায়ুর বলেই সমুদ্রের উপর দিয়া দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিত।



চিত্র 8. বায়ুচালিত কল

বায়ুচালিত কল (Windmill) ঃ বায়ুর বল কাজে

লাগাইয়া বায়ুচালিত কল (windmill) প্রস্তুত করা যায়। এককালে এইরূপ কল দ্বারা গমভাঙ্গান প্রভৃতি কাজ হইত।

ঐ কলে বড় বড় পাখা লাগান থাকে। বায়ুর বেগে ঐ পাখা ঘুরিলে উহার ঘূর্ণন-দণ্ডের সহিত সংযুক্ত কলও ঘুরে। বায়ুপ্রবাহ না থাকিলে এই কলের দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না, সেইজন্য এই কলের ব্যবহার এখন আর নাই।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. বায়ুর ওজন আছে,—ইহা কি ভাবে প্রমাণ করা যায়?
2. "বায়ু বল উৎপন্ন করে"—কথাটি দ্বারা কি বোঝ?
3. বায়ুর বল কাজে লাগাইয়া আমরা কি কি সুবিধা পাই?
4. বায়ুর বল আমাদের কোন ক্ষতি করে কি? কোন্ অবস্থায়?
5. বায়ুতে কাজ করিবার শক্তি আসে কোথা হইতে?
6. বর্তমানে পালের জাহাজ ও বায়ু-চালিত কলের ব্যবহার নাই কেন?

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
   (*a*) পৃথিবীর উপরে বায়ুর আবরণের গভীরতা — কিলোমিটারেরও বেশী।
   (*b*) — সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বাসকার্য চালায়।
   (*c*) — সাহায্যে আমরা নৌকা চালাই, ঘুড়ি উড়াই।
   (*d*) বায়ুর — কাজে লাগাইয়া বায়ুচালিত কল প্রস্তুত করা যায়।
2. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে ✓ এইরূপ চিহ্ন দাও এবং যেগুলি শুদ্ধ নহে সেগুলির পাশে × এইরূপ চিহ্ন দাও।
   (i) বায়ুর ওজন নাই।
   (ii) বায়ুতে বলের সঞ্চার হয়।
   (iii) বায়ুপ্রবাহ না থাকিলেই ঘুড়ি উড়ান সম্ভব।

প্রথম পাঠ

1. জলের বাষ্পীভবন (Water evaporates) :

বাষ্পীভবন (Evaporation) : কোন চ্যাপ্টা মুখ-খোলা পাত্রে, যেমন থালায়, সামান্য পরিমাণ জল রাখিলে ঐ জল কয়েক ঘণ্টা পরে শুকাইয়া যায় ; ইহার কারণ, জল তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া, অর্থাৎ বাষ্প হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়। ভিজা কাপড়-গামছা প্রভৃতির জলও এইভাবে শুকাইয়া থাকে, ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ।

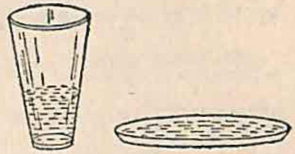
এইভাবে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি হইতে জল ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং ইহার ফলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে উহাদের জল কমিয়া যায়। এই প্রকারে আপনা হইতেই সর্বদা জল যে প্রণালীতে শুকাইয়া যায়, অর্থাৎ বাষ্প হইয়া যায়, সেই প্রণালীকে **বাষ্পীভবন** বলে। জলের বাষ্পীভবন সকল উষ্ণতায়, সকল চাপে সব সময় অল্প-বিস্তর হইয়া থাকে। সেইজন্য দেখা যায় যে, বৃষ্টির দিনেও আমাদের ভিজা কাপড়জামা শুকায়।

জলের এই বাষ্পীভবনের হার নির্ভর করে জলের উপরিতলের বিস্তৃতির উপর। কারণ বাষ্পীভবন হইয়া থাকে জলের উপরিভাগ হইতে। এক গ্লাস জল থালায় ঢালিয়া রাখিলে যত তাড়াতাড়ি শুকাইবে, গ্লাসে রাখিলে তত তাড়াতাড়ি শুকাইবে না।

আবার, বায়ুপ্রবাহ থাকিলে বাষ্পীভবন যত দ্রুত হয়, বায়ু-প্রবাহ না থাকিলে তত তাড়াতাড়ি হয় না।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, জলের উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, জলের উপরিতলের বিস্তৃতি, জলের উপর বায়ুর চাপ প্রভৃতির উপর জলের বাষ্পীভবন নির্ভর করে।

পরীক্ষা ঃ একটি গ্লাসে সামান্য একটু জল এবং একটি থালায় সমপরিমাণ জল ঢাল। এইভাবে থালা ও গ্লাসটিকে না ঢাকিয়া খোলা জায়গায় রাখিয়া দাও।



চিত্র 9. বাষ্পীভবনের পরীক্ষা

কয়েকদিন পরে লক্ষ্য করিয়া দেখ, থালায় একটুও জল নাই ; কিন্তু গ্লাসে সামান্য জল রহিয়াছে—তবে এই জল পূর্বাপেক্ষা কম।

বাষ্পীভবনের জন্যই থালায় জল নাই এবং গ্লাসের জলও কমিয়া গিয়াছে। থালা অপেক্ষা গ্লাসে জলের বাষ্পীভবন কম হইয়াছে বলিয়া গ্লাসে এখনও সামান্য জল রহিয়াছে।

বাষ্পীভবনের কয়েকটি ফল ঃ ভিজা গামছা গায়ে জড়াইয়া রাখিলে আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি। ইহার কারণ, ভিজা গামছার জল বাষ্পীভবনের জন্য আমাদের শরীর হইতে তাপ আহরণ করে ; ফলে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়।

গ্রীষ্মকালে জল ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য আমরা মাটির কুঁজা ব্যবহার করি। পিতলের কলসীর জল অপেক্ষা মাটির কুঁজার জল বেশী ঠাণ্ডা হয়। ইহার কারণ, মাটির কুঁজার গায়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া খুব সামান্য পরিমাণ জল সর্বদাই চুঁয়াইয়া বাহিরে আসে এবং বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এই জল বাষ্প হইবার কালে কুঁজার জল হইতে তাপ আহরণ করে বলিয়া কুঁজার জল ঠাণ্ডা থাকে। পিতলের কলসীর গা হইতে ঐভাবে বাষ্পীভবন হইতে পারে না। সেইজন্য ঐ জল ঠাণ্ডা থাকে না।



চিত্র 10. মাটির কুঁজা

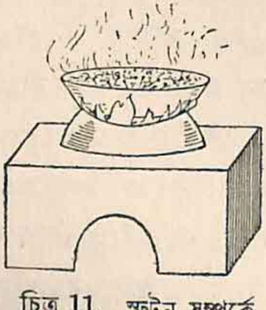
স্ফুটন (Boiling) ঃ কোন পাত্রে জল লইয়া আগুনে গরম করিতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে ঐ জল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে, ইহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহাকেই জলের

স্ফুটন বলে। জলকে ফুটাইলে জলও বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। কিন্তু বাষ্পীভবনের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। বায়ুর স্বাভাবিক চাপে এই জল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফুটিয়া থাকে। তবে বায়ুর চাপ কম থাকিলে জল কম তাপমাত্রায় এবং বায়ুর চাপ বেশী হইলে জল বেশী তাপমাত্রায় ফুটিয়া থাকে। মোট কথা, বাষ্পীভবনের মত স্ফুটন সমস্ত তাপমাত্রায় ঘটে না ; স্ফুটন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘটিয়া থাকে।

যে তাপমাত্রায় জল ফুটিয়া থাকে, উহাকে জলের **স্ফুটনাঙ্ক** (boiling point) বলে। জলের স্ফুটনাঙ্ক 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বিভিন্ন তরলের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন।

বাষ্পীভবন এবং স্ফুটনের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। বাষ্পীভবন সর্বদা তরলের উপরিভাগ হইতে ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু স্ফুটন ঘটিয়া থাকে সমগ্র তরল হইতে। জল যখন ফোটে তখন সমগ্র জল আলোড়িত হইয়া বুদ্‌বুদের আকারে বাষ্পে পরিণত হয়।

পরীক্ষা : একটি মুখ-খোলা পাত্রে কিছু জল লও। এই জলের মধ্যে কিছু কাল রংয়ের লোহার ছোট ছোট পেরেক ডুবাইয়া রাখ। এইবার পেরেকসহ জলের পাত্রটিকে গরম কর। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছে এবং জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।



চিত্র 11. স্ফুটন সম্পর্কে পরীক্ষা

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ, কাল রংয়ের ছোট ছোট লোহার পেরেকগুলি পাত্রের জলের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছে। জলের আলোড়নের সঙ্গে পেরেকগুলিও আলোড়িত হইতেছে।

ইহা হইতে বুঝা গেল, জল ফুটিবার কালে সমস্ত জল আলোড়িত হইয়া বাষ্প হয়—কেবলমাত্র উপরিভাগ হইতে বাষ্প হয় না।

বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের তুলনা

বাষ্পীভবন	স্ফুটন
1. বাষ্পীভবন নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘটে।	1. স্ফুটন সশব্দে দ্রুত ঘটে।
2. বাষ্পীভবন সকল উষ্ণতায় ঘটে।	2. স্ফুটন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটে।
3. বাষ্পীভবন তরলের উপরিতল হইতেই ঘটে।	3. স্ফুটনকালে তরলের সকল স্থান হইতে স্টীম নির্গত হয়।
4. বাষ্পীভবনে তরলের উষ্ণতা কমিয়া যায়।	4. স্ফুটনকালে তরলের উষ্ণতার ঐরূপ কোন হ্রাস হয় না।
5. বায়ুর চাপ কমিলে তরলের বাষ্পীভবন দ্রুত ঘটে।	5. বায়ুর চাপ কমিলে তরলের স্ফুটনাঙ্কের হ্রাস পায়, কিন্তু স্ফুটনের হার সর্বদা সমান থাকে।
6. বাষ্পীভবনকালে তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থের চাপ বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম।	6. স্ফুটনের সময় তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থের চাপ বায়ুর চাপের সমান।

ঘনীভবন (Condensation) ঃ জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে উহা তাপ হারাইয়া পুনরায় জলে পরিণত হয়। গ্লাসে বরফ রাখিলে দেখা যায় যে, গ্লাসের বাহিরে বায়ুর জলীয় বাষ্প তরল হইয়া জমিয়া জল হয়।

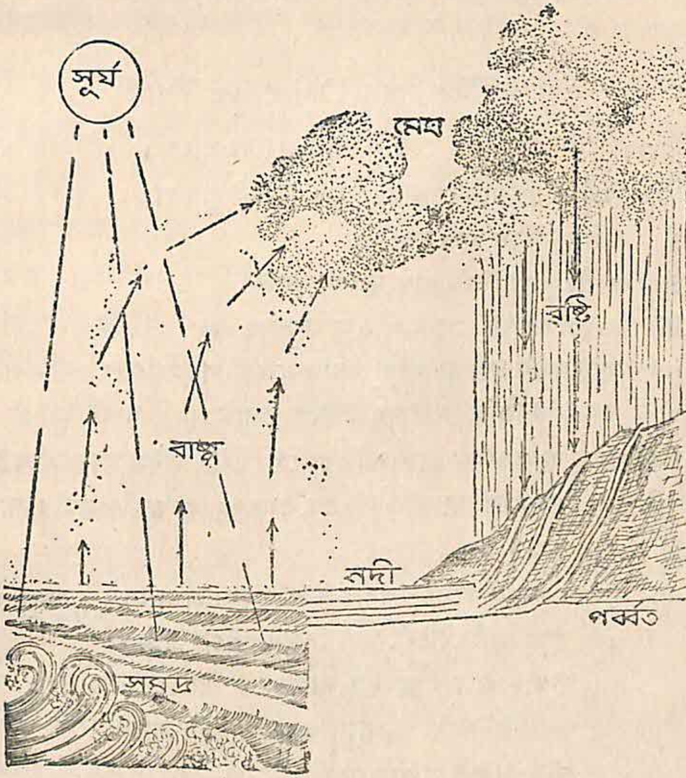
ক্রমান্বয়ে বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের ফলেই যথাক্রমে মেঘ ও বৃষ্টি হয়।

মেঘ (Cloud): জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালকা। সেইজন্য উহা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের বায়ু নীচের বায়ু অপেক্ষা বেশী শীতল। আবার নীচের জলীয় বাষ্পপূর্ণ হালকা বায়ু উপরে উঠিলে উহার উপরে উপরকার বায়ুর চাপ কমিতে থাকে। সেইজন্য ঊর্ধ্বগামী বায়ু প্রসারিত হয়। বায়ু প্রসারিত হইলে শীতল হয়। এই দুই কারণে উপরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল হয়। উষ্ণতা কমিয়া গেলে বায়ুর জলীয় বাষ্পধারণের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। সুতরাং তখন ঊর্ধ্বগামী বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং আকাশে ভাসিতে থাকে। ইহাকে **মেঘ** বলে।

বৃষ্টি (Rain): মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। আকাশে বায়ুভরে খণ্ড খণ্ড মেঘ ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইবার কালে একত্র হইয়া বড় মেঘে পরিণত হয়। এই সকল মেঘ অত্যধিক ঠাণ্ডায় আরও শীতল হইলে ছোট ছোট জলকণাগুলি একত্র হইয়া বড় বড় জলের ফোঁটায় পরিণত হয়। অধিক ভারের জন্য উহারা আর তখন বায়ুতে ভাসিতে পারে না, পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে ঝরিয়া পড়ে। ইহাকেই আমরা **বৃষ্টি** বলিয়া থাকি।

বৃষ্টিচক্র (Rain Cycle): সমুদ্র, নদী, খাল-বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাষ্পীভবন হইয়া উহাদের জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। যদি এই বাষ্পীভবন একটানা চলিতে থাকিত, তবে কয়েকশত বৎসরে পৃথিবীর সমুদয় জল শুকাইয়া যাইত। কিন্তু এই ঊর্ধ্বগামী জলীয় বাষ্প জমিয়া মেঘ হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির কতক জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রস্রবণ-রূপে আবার ভূপৃষ্ঠে চলিয়া আসে। অধিকাংশ জল নদীপ্রবাহের সহিত সাগরে চলিয়া যায়। আবার সাগর, নদী প্রভৃতি হইতে বাষ্পীভবন হইয়া উহাদের জল বাষ্পে

পরিণত হইয়া মেঘ সৃষ্টি করিতেছে এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি



চিত্র 12. বৃষ্টিচক্র

হইতেছে। এই প্রকারে বাষ্পীভবনের দ্বারা বৃষ্টিচক্র পরিবর্তিত হইতেছে।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. বাষ্পীভবন কাহাকে বলে? বাষ্পীভবন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

2. স্ফুটন কাহাকে বলে? বাষ্পীভবন ও স্ফুটনে পার্থক্য কি?

3. মাটির কুঁজার জল পিতলের কলসীর জল অপেক্ষা ঠাণ্ডা হয় কেন?

4. ঘনীভবন কাহাকে বলে? মেঘ কি ভাবে উৎপন্ন হয়?

5. "বাষ্পীভবনের দ্বারা বৃষ্টিচক্র পরিবর্তিত হইয়াছে",—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে ✓ এই দাগ দাও এবং যেগুলি শুদ্ধ নহে সেগুলির পাশে × এই দাগ দাও।
   - (i) জল ফুটাইলে বাষ্প হয়।
   - (ii) জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা ভারী।
   - (iii) বায়ুপ্রবাহ থাকিলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয় না।
   - (iv) স্ফুটনকালে তরলের সকল স্থান হইতে বাষ্প নির্গত হয়।
   - (v) জল 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ফোটে।

2. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তিনটি করিয়া কারণ দেখানো হইয়াছে। তিনটির মধ্যে একটি শুদ্ধ, কেবলমাত্র শুদ্ধ কারণটির পার্শ্বে O (গোল দাগ) দাও।
   - (*a*) কুঁজার জল পিতলের কলসীর জল অপেক্ষা ঠাণ্ডা হয়। কারণ—
     - (i) কুঁজা মাটির তৈরী, উহা পিতল হইতে ঠাণ্ডা।
     - (ii) কুঁজার গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া বাহিরে আসে ও বাষ্প হইয়া যায়। সেই কারণে কুঁজা ও জল ঠাণ্ডা হয়।
     - (iii) কুঁজার গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে; ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ু-চলাচল হয় বলিয়া কুঁজার জল ঠাণ্ডা হয়। পিতলের কলসীর গায়ে ছিদ্র নাই, তাই উহার ভিতর দিয়া ঐরূপ বায়ু-চলাচল হইতে পারে না।
   - (*b*) বৃষ্টিচক্র সম্ভব হয়। কারণ—
     - (i) নদীর জল ঢালুর দিকে গড়াইয়া সমুদ্রে যাইতে পারে।
     - (ii) মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়।
     - (iii) জল তাপে বাষ্প হয় এবং শৈত্যে ঘনীভূত হইয়া আবার জল উৎপন্ন হইতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ

2. (a) দ্রাব এবং দ্রাবক (Solute and solvent):

দ্রবণ (Solution): একটি গ্লাসে জল লও এবং তাহার মধ্যে সামান্য চিনি মিশাও। এই চিনি জলের মধ্যে মিশিয়া যাইবে এবং জলের মধ্যে চিনির কোন চিহ্নই দেখা যাইবে না। গ্লাসে স্বচ্ছ চিনি-জল প্রস্তুত হইবে।

অপর একটি গ্লাসে পরিষ্কার জলের মধ্যে সামান্য লবণ মিশাও। এই লবণও জলের মধ্যে মিশিয়া যাইবে এবং জলের মধ্যে লবণের কোন চিহ্নই দেখা যাইবে না। গ্লাসে স্বচ্ছ লবণ-জল প্রস্তুত হইবে।

এই দুইটি গ্লাসে জলের সঙ্গে অন্য পদার্থের (চিনি ও লবণ) মিশ্রণে যাহা প্রস্তুত হইল (চিনি-জল ও লবণ-জল), তাহাকে **দ্রবণ** বলে।

দ্রবণের দুইটি অংশ। যাহা মিশ্রিত করা হয় এবং গলিয়া যায় (চিনি ও লবণ), তাহাকে **দ্রাব** (solute) বলে এবং যাহার মধ্যে দ্রাব মিশ্রিত করা হয় (জল), তাহাকে **দ্রাবক** (solvent) বলে।

সুতরাং দেখা গেল যে, দ্রাব এবং দ্রাবকের মিশ্রণে যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে **দ্রবণ** বলে ; অর্থাৎ, **দ্রবণ = দ্রাব + দ্রাবক**।

দ্রাব্য পদার্থ: কেবলমাত্র চিনি এবং লবণই জলে দ্রবীভূত হয় না ; ফটকিরি, তুঁতে, সোডা প্রভৃতিও জলে দ্রবীভূত হয় সুতরাং চিনি, লবণ, ফটকিরি তুঁতে, সোডা প্রভৃতি জলে দ্রাব্য কোন তরল পদার্থে যে সকল জিনিস দ্রবীভূত হয়, সেই সকল জিনিসকে ঐ তরলে **দ্রাব্য** বলে। লোহা জলে দ্রাব্য নহে, এ্যাসিডে দ্রাব্য ; বার্নিশ জলে দ্রাব্য নহে, স্পিরিটে দ্রাব্য।

অদ্রাব্য পদার্থ: জলে বালি ঢালিলে ঐ বালি কখনও দ্রবীভূত হইবে না। বালি, চাখড়ি প্রভৃতি জলে অদ্রাব্য। লোহা এবং বার্নিশ যে জলে অদ্রাব্য, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। কোন

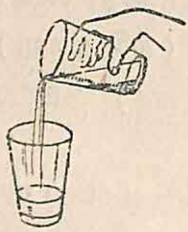
তরল পদার্থে যে সকল জিনিস দ্রবীভূত হয় না, সেই সকল জিনিসকে ঐ তরলে **অদ্রাব্য** বলে।

(b) রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical processes) ঃ

নদী, পুকুর প্রভৃতি সাধারণ জলাশয়গুলির জলে নানাপ্রকার অদ্রাব্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। জলের মধ্যে মিশ্রিত এই সকল অদ্রাব্য পদার্থ কি প্রকারে পৃথক করা যায়, এখানে তাহার কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

(i) থিতান (Sedimentation) ও আস্রাবণ (Decantation) ঃ

পরীক্ষা ঃ একটি পাত্রে জল লইয়া উহাতে মাটি ও বালি মিশ্রিত কর। পাত্রটি এক জায়গায় রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখ, বালি ও মাটি নীচে জমিয়া আছে। উপরে কতকটা পরিষ্কার জল আছে। এই প্রক্রিয়াকে **থিতান** বলে।



চিত্র 13. আস্রাবণ

এইবার ধীরে ধীরে পাত্রটি কাত করিয়া উপরের পরিষ্কার জলকে অপর পাত্রে ঢাল। ভারী অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ হইতে পরিষ্কার জল পৃথক হইয়া যাইবে। ইহাকে **আস্রাবণ** বলে।

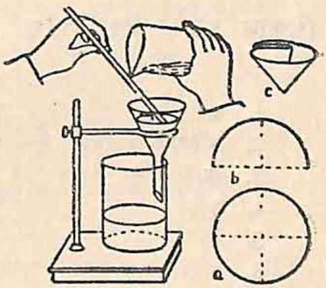
থিতান ঃ ধূলা, বালি বা অন্য কোন অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ-মিশ্রিত অপরিস্কৃত তরলকে স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে যেভাবে সেই অদ্রাব্য পদার্থ ধীরে ধীরে তলায় পড়িয়া যায় সেই পদ্ধতিকে **থিতান** বলে।

আস্রাবণ (Decantation) ঃ কোন তরলের মধ্যে ভাসমান অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ থিতাইয়া ফেলিয়া উপরের পরিষ্কার তরলকে অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইবার পদ্ধতিকে **আস্রাবণ** বলে।

(ii) **পরিস্রাবণ** (Filtration) ঃ ফিল্টার ও ব্লটিং-কাগজে, ন্যাকড়া ও কাঠ-কয়লাতে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। যখন

কোন অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ জল ফিল্টার-কাগজের উপরে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন জল উহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় এবং অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ কাগজের উপরে থাকিয়া যায়।

পরীক্ষা ঃ একখানা ব্লটিং-কাগজ (blotting paper) গোল করিয়া কাট কিংবা একখানি ফিল্টার-কাগজ (filter-paper) লও। তৎপরে উহাকে দুইবার পর পর অর্ধেক ভাঁজ কর ; ইহাতে গোল ফিল্টার-কাগজখানা চারিভাগে বিভক্ত হইল। ইহার তিন ভাঁজ একদিকে ও এক ভাঁজ একদিকে রাখিয়া একটি শঙ্কু গঠন কর। এই শঙ্কুকে একটি কাচের ফানেলে বসাও। কাগজকে কয়েক ফোঁটা জল দিয়া ভিজাইয়া ফানেলের গায়ে ভালভাবে লাগাইয়া দাও। ফানেলের নীচে একটি পাত্র এমনভাবে রাখ, যাহাতে ফানেলের নীচের সরু অংশ পাত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে। একটি দণ্ডের গা দিয়া কাদাজল ফানেলে ঢাল। জল ফিল্টার-কাগজের ছিদ্রের মধ্য দিয়া নীচের পাত্রে চলিয়া যায়। অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ কাগজের উপর আটকাইয়া থাকে।



চিত্র 14. পরিস্রাবণ

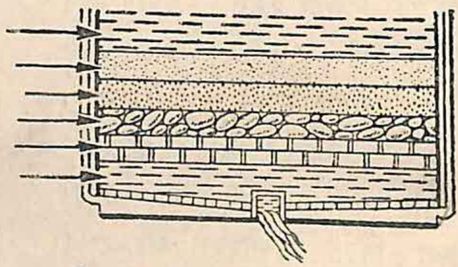
এই পদ্ধতিকে **পরিস্রাবণ** বা **ছাঁকন** বলে। নীচের তরলকে **পরিস্রুত তরল** (filtrate) বলে। আমরা সাধারণতঃ ন্যাকড়া বা ছাঁকনি দিয়া চা, দুধ প্রভৃতি ছাঁকি।

পরিস্রাবণ (Filtration) ঃ অদ্রাব্য কঠিন পদার্থমিশ্রিত কোন তরলকে সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা অথবা ফানেলের মধ্যে স্থাপিত ফিল্টার-কাগজের সাহায্যে ছাঁকিয়া পরিস্রুত করিবার পদ্ধতিকে **পরিস্রাবণ** বলে।

অবশেষ (Residue) : পরিস্রাবণের পরে ফিল্টার কাগজে যে কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকে, তাহাকে **অবশেষ** বলে।

পরিস্রুত তরল (Filtrate) : সূক্ষ্ম কাপড় বা ফিল্টার-কাগজের সাহায্যে ছাঁকিবার ফলে যে স্বচ্ছ তরল নীচে পড়ে, তাহাকে **পরিস্রুত তরল** বলে।

শহরের পরিস্রুত জল : আজকাল বড় বড় শহরে নদী বা পুকুর হইতে জল পাম্প করিয়া কতকগুলি চৌবাচ্চায় (tank বা cistern) থিতান হয়। ইহাদিগকে থিতান-চৌবাচ্চা (settling tank)



চিত্র 15. শহরে জলের পরিস্রাবণ

বলে। অনেক সময় ময়লা দ্রুত থিতাইবার জন্য জলে ফটকিরি দেওয়া হয়। থিতান জলে চাপ প্রয়োগ করিয়া এই জল কতকগুলি উন্মুক্ত চৌবাচ্চায় লওয়া হয়। এইখানে সূর্যকিরণে ও বায়ুতে অনেক রোগবীজাণু নষ্ট হয়। তৎপরে ঐ জল অন্য চৌবাচ্চায় প্রেরিত হয়। ইহাদিগকে ফিল্টার-বেড (Filter bed) বলে। এই সকল চৌবাচ্চার মধ্যে উপর হইতে পর পর সূক্ষ্ম বালি, মোটা বালি ও নুড়ির স্তর থাকে। এই সকল স্তরের মধ্য দিয়া যাইয়া পরিস্রুত জল নীচে একটি চৌবাচ্চায় জমে।

পারিবারিক ব্যবহারের জন্য আজকাল বার্কফিল্ড (Berkfeld) ও পাস্তুর ফিল্টার কিনিতে পাওয়া যায়। পাস্তুর ফিল্টারে অমসৃণ চীনামাটির সচ্ছিদ্র নলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় জল পরিস্রুত হয়।

আস্রাবণ ও পরিস্রাবণের পার্থক্য

আস্রাবণ	পরিস্রাবণ
1. আস্রাবণ পদ্ধতিতে ভাসমান কঠিন পদার্থ থিতাইয়া পড়ে।	1. পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে ভাসমান কঠিন পদার্থ ফিল্টার-কাগজে বা সূক্ষ্ম কাপড়ে ছাঁকা হয়।
2. কঠিন পদার্থ সাধারণতঃ তরল অপেক্ষা ভারী বলিয়া থিতাইয়া পড়ে। কঠিন পদার্থ যদি তরল অপেক্ষা ভারী না হয়, তবে আস্রাবণ সম্ভব নহে।	2. কঠিন পদার্থের তরল অপেক্ষা হালকা-ভারী গুণের উপর পরিস্রাবণ নির্ভর করে না,—কারণ তরল ছাঁকিয়া কঠিন পদার্থ পৃথক করা হয়।
3. সূক্ষ্ম ভাসমান পদার্থ আস্রাবণ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথক করা কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ।	3. সূক্ষ্ম ভাসমান কঠিন পদার্থও সহজে অল্প সময়ে পৃথক করা হয়।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. দ্রবণ কাহাকে বলে ?
2. অদ্রাব্য পদার্থ কাহাকে বলে ? জলে অদ্রাব্য কতিপয় পদার্থের নাম কর।
3. দ্রাবক ও দ্রাব কাহাকে বলে ?
4. আস্রাবণ ও পরিস্রাবণ কাহাকে বলে ?
5. আস্রাবণ ও পরিস্রাবণের তুলনা কর।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(*a*) — প্রক্রিয়া দ্বারা অদ্রাব্য পদার্থ জল হইতে পৃথক করা যায়।

(*b*) শহরের জল — দ্বারা বিশোধিত হয়।

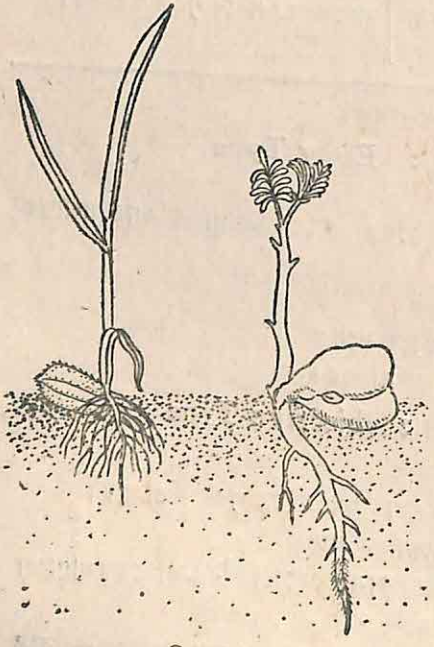
(*c*) অদ্রাব্য কঠিন পদার্থমিশ্রিত কোন তরলকে ফিল্টার-কাগজের সাহায্যে ছাঁকিয়া পরিস্রুত করিবার পদ্ধতিকে — বলে।

(*d*) পরিস্রাবণের পরে ফিল্টার-কাগজে যাহা থাকে তাহাকে — বলে এবং যে স্বচ্ছ তরল নীচে পড়ে তাহাকে — তরল বলে।

(*e*) লোহা — এবং বার্নিশ — দ্রাব্য।

উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য উত্তম মাটিতে অবশ্যই প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকিবে (Good soil must have enough of the minerals required for growth of plants.) :

মাটি (Soil) : পৃথিবীর স্থলভাগে যেখানে সাধারণতঃ উদ্ভিদ জন্মে, তাহাকেই আমরা **মাটি** বলি। মাটি একপ্রকার মিশ্র পদার্থ। ইহা নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, নানাপ্রকার জীবাণু, জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। মাটিকে দেখিতে ছিদ্রহীন ও নিরেট মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাতে প্রচুর ছিদ্র আছে এবং ঐ সকল ছিদ্র দিয়া জল ও বায়ু চলাচল করিতে পারে। মাটিতে জল ঢালিলে সেই জল কিছুক্ষণ পরে শুষিয়া যায়; মাটির অসংখ্য ছিদ্র দিয়া সেই জল মাটির উপর হইতে নীচে চলিয়া যায়।



চিত্র 16.
সচ্ছিদ্র মাটির মধ্যে চারাগাছের মূল

মাটিতে ছিদ্র আছে বলিয়াই কচি কচি চারাগাছের কোমল মূলও মাটি ভেদ করিতে পারে। মাটি ছিদ্রহীন ও নিরেট হইলে কখনও ইহা সম্ভব হইত না।

উদ্ভিদের খাদ্য ও উহার উৎস : উদ্ভিদভস্ম লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

উহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন (লৌহ) প্রভৃতি উপাদান বর্তমান। এই সকল উপাদান উদ্ভিদের দেহে কোথা হইতে আসিল? এই সকল উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ বায়ু হইতে কার্বন, জল হইতে হাইড্রোজেন ও জল ও বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং মৃত্তিকা হইতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, সালফার, ক্লোরিন প্রভৃতি গ্রহণ করে।

জলকৃষ্টি পরীক্ষা (Water-Culture Experiment): মাটিতে এই সকল পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ-দেহের কি ক্ষতি হয়, তাহা **জলকৃষ্টি পরীক্ষা** দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এই পরীক্ষা জল ও বায়ুর মধ্যে করিতে হয়। সুতরাং উল্লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অভাব বোঝা যাইবে না।

নীতি: এই পরীক্ষার নীতি হইল যে, সাতটি মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন লবণরূপে পরিস্রুত জলের সহিত মিশাইয়া জলকৃষ্টির জল প্রস্তুত করিতে হয়। মিশ্রিত দ্রবণে এক একটি মৌলিক পদার্থের অভাব রাখিয়া সেই দ্রবণের মধ্যে চারাগাছ বাড়িতে দিয়া বিভিন্ন চারার বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষ্য করিতে হয়। এইরূপ দ্রবণকে **"নপ"-এর কৃষ্টি দ্রবণ** (Knop's Culture Solution) বলে।

পরীক্ষা: নিম্নলিখিত পাঁচটি লবণকে ক্রমানুসারে ওজন করিয়া কাগজে মুড়িয়া রাখ।

(i)	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	1·0 গ্রাম
(ii)	পটাসিয়াম নাইট্রেট	0·2 গ্রাম
(iii)	পটাসিয়াম ফস্ফেট	0·2 গ্রাম
(iv)	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	0·2 গ্রাম
(v)	ফেরিক ক্লোরাইড	অতি সামান্য

একই আকারের নয়টি কৃষ্টিপাত্র লও। প্রত্যেক পাত্রের মুখ দুই ছিদ্রবিশিষ্ট কর্কের দ্বারা বন্ধ কর। মধ্যের ছিদ্র হইতে কর্কের

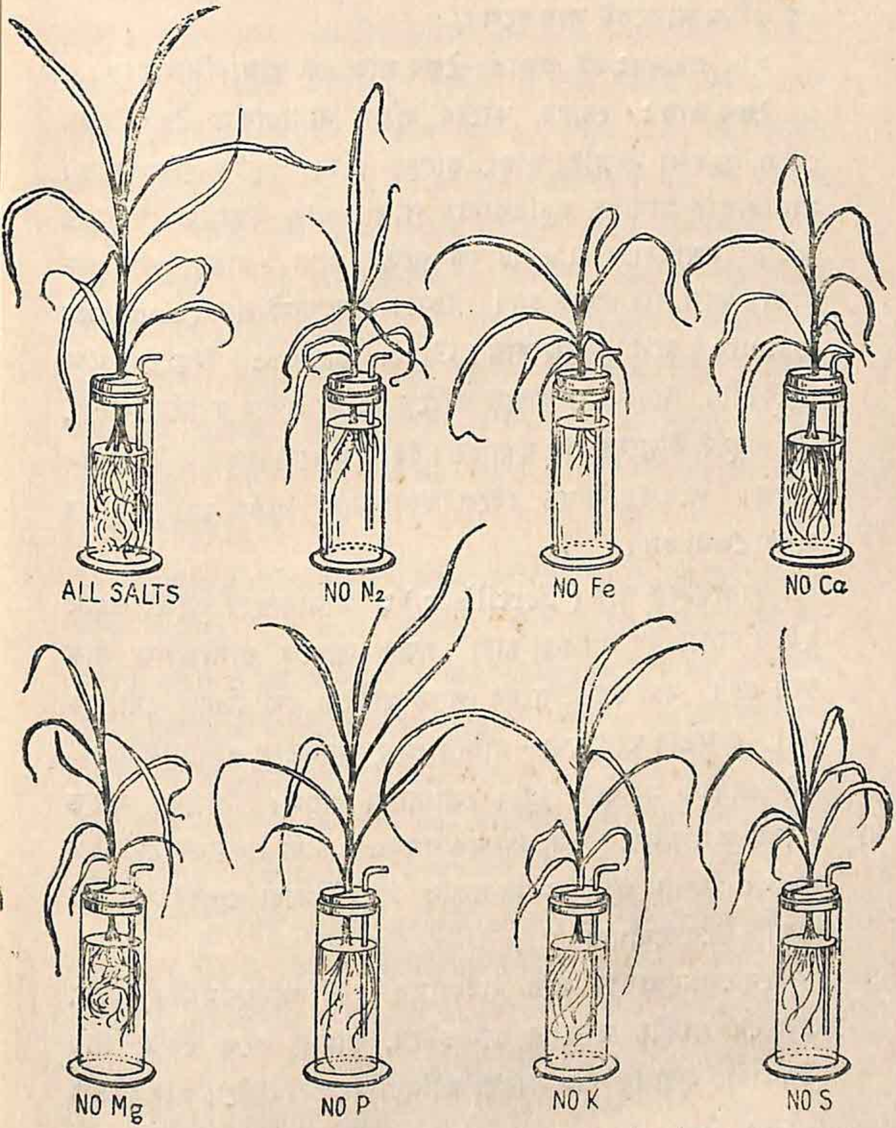
কিনারা পর্যন্ত চিরিয়া রাখ যাহাতে সহজে চারাগাছ কর্কের ছিদ্রের মধ্যে ঢোকানো যায়। বোতলে বায়ু-চলাচলের জন্য পার্শ্বের ছিদ্র দিয়া একটি বাঁকা কাচের নল প্রবেশ করাও। প্রথম পাত্রে সাধারণ কৃষ্টি দ্রবণ ঢাল, অপর সাতটি পাত্রের জন্য কৃষ্টি দ্রবণ এমনভাবে প্রস্তুত কর যাহাতে পর্যায়ক্রমে একটি করিয়া লবণ বাদ থাকে। নবম পাত্রে শুধু পাতিত জল লও। নবম পাত্র চিত্রে দেখানো হয় নাই।

কিছু কাঠের গুঁড়া জলে ফুটাইয়া লও ; কাঠের গুঁড়া জীবাণুমুক্ত হইবে। ইহার মধ্যে কয়েকটি ভাল ভুট্টার বীজ পুঁতিয়া দাও। কয়েকদিনেই ভাল ভুট্টার চারা গজাইবে। এখন নয়টি সমান বৃদ্ধির ও সমান ওজনের ভুট্টার চারাগাছ লও। উহাদের মূল ভাল করিয়া পাতিত জলে ধুইয়া ছিপির মধ্যস্থানে ছিদ্রের মধ্য দিয়া এমনভাবে প্রবেশ করাও যাহাতে চারাগাছের মূল দ্রবণের মধ্যে থাকে এবং পাতা বায়ুতে থাকে। পাত্রগুলি কাল কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও যেন মূল আলো না পায়। এইবার পাত্রগুলিকে আলোতে ফাঁকা জায়গায় রাখ। পাত্রের মধ্যে পনের মিনিট অন্তর বায়ু প্রবেশ করাও। প্রতি সপ্তাহে একবার কৃষ্টির দ্রবণ বদলাও। ছয় মাস যাবৎ চারাগুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য কর।

পর্যবেক্ষণ : দেখা যায় যে, প্রথম পাত্রে গাছের ভাল বৃদ্ধি হইয়াছে ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের গাছ খর্ব হইয়াছে ; সপ্তম পাত্রের গাছের পাতা বিবর্ণ হইয়াছে ; অষ্টম পাত্রের গাছ খর্ব ও বিকৃত হইয়াছে এবং নবম পাত্রের গাছ মরিয়া গিয়াছে।

সিদ্ধান্ত : (1) গাছের পুষ্টির জন্য সকল প্রকার লবণ প্রয়োজন। (2) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম গাছের সাধারণ বৃদ্ধির সাহায্য করে। (3) ক্লোরোফিল উৎপাদনের জন্য লৌহ অত্যাবশ্যক। সেইজন্য লৌহের অভাবে পাতার রং হলদে হয়। (4) নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের বৃদ্ধি হয় না, পাতাও কম হয়।

(5) পটাসিয়ামের অভাবে পাতায় দাগ পড়ে এবং পাতা মচ্‌মচে হয়।



চিত্র 17. জল-কৃষ্টি পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদের সাতটি মৌলিক উপাদানের উপকারিতা প্রদর্শন

সার (Manure) : জমির উর্বরতা হ্রাস পাইলে মাটিতে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের উপযোগী কৃত্রিম খাদ্য মিশাইয়া দিতে হয়। উদ্ভিদের এই কৃত্রিম খাদ্যকেই **সার** বলে।

সার প্রধানতঃ দুই প্রকার—**জৈব সার** এবং **রাসায়নিক সার**।

জৈব সার : গোবর, কাঠের গুঁড়া, নানাপ্রকার তৈলবীজের খোল, ড্রেন বা নর্দমার কাদা, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি জৈব সার। নানাপ্রকার আগাছা, কচুরিপানার পাতা, ঘাস ইত্যাদি গোবরের সহিত মিশাইয়া উহা একটি বড় গর্তের মধ্যে পচাইয়া আর এক প্রকার ভাল সার প্রস্তুত হয়। ইহাকে **কম্পোস্ট সার** (Compost manure) বলে। **সবুজ সার** (Green manure) উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। সবুজ সার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জমিতে ধইঞ্চা, শণ প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে। পরে ইহারা বড় হইলে ইহাদিগকে জমির মাটির সহিত চষিয়া ফেলা হয়।

রাসায়নিক সার (Fertiliser) : নানাপ্রকার অজৈব পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত সারকে **রাসায়নিক সার** বলা হয়। সচরাচর উদ্ভিদের পক্ষে মাটিতে যে তিনটি মৌলিক পদার্থের অভাব ঘটে, যথা—নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম—এই জাতীয় সারগুলি তাহা জোগাইয়া থাকে। ইহাদের সহিত প্রায়ই ক্যালসিয়াম এবং কখনও কখনও এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থও মিশান হয়। নানাপ্রকার সারের মধ্যে সুপার ফস্‌ফেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যে কোন প্রকার সার ব্যবহারের পূর্বে জমির মাটির অবস্থা এবং যে জাতীয় ফসলের চাষ হইবে, তাহার পক্ষে কোন্ সার উপকারী, ইত্যাদি ভাল করিয়া জানিয়া তবেই মাটিতে সার দেওয়া উচিত।

পর্যায়ক্রমে চাষ (Rotation of Crops) : একই জমিতে

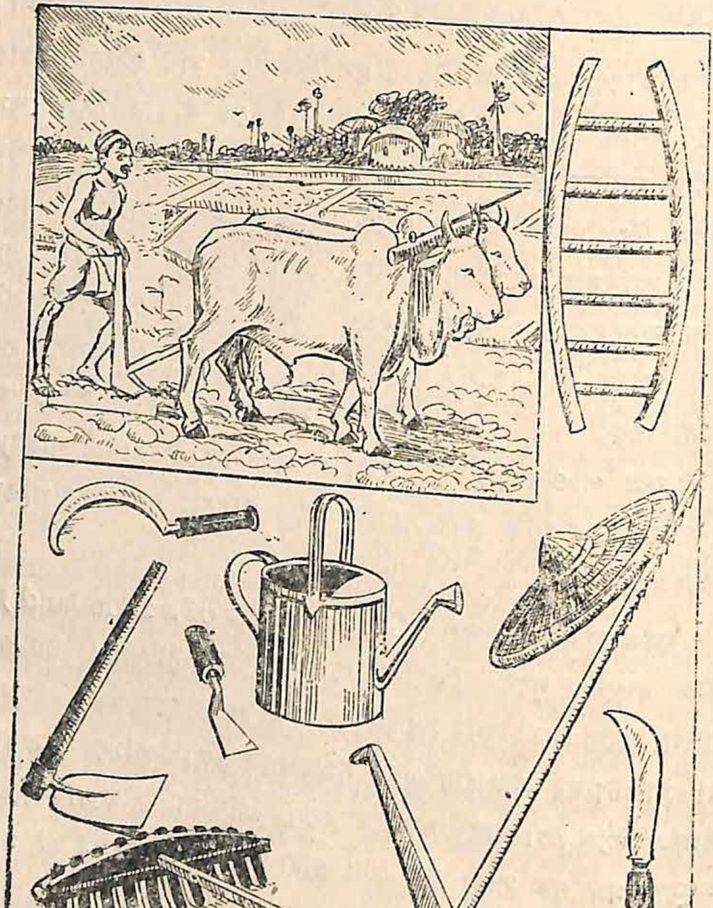
বৎসরের পর বৎসর একই শস্যের চাষ করিলে ঐ জমি ক্রমশঃ অনুর্বর হইয়া পড়ে। তখন আর ঐ জমি ভাল ফসল দিতে পারে না। ইহার কারণ, একই জাতীয় উদ্ভিদ ক্রমান্বয়ে মাটি হইতে তাহার প্রয়োজনীয় একই জাতীয় লবণগুলি লইতে থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত মাটিতে উহাদের অভাব ঘটে। তখন আর ঐ মাটির ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। এইজন্যই মাটিকে বরাবর উর্বর রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর উহাতে উহার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করিতে হয়। এইরূপ চাষের পদ্ধতিকেই **পর্যায়ক্রমে চাষ** বলে। এই সকল পর্যায়ক্রমিক ফসলগুলির মধ্যে একটি শণ, ধইঞ্চা, মটর বা মুগ জাতীয় হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহারা জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। প্রতি চারি বৎসর অন্তর জমিকে এক বৎসর পতিত রাখা দরকার।

কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ (Observations of a farm land) ঃ বীজ বপনের পূর্বে জমি উত্তমরূপে চাষ করা দরকার। দুই এক পশলা বৃষ্টির পরেই জমির মাটি আলগা করিয়া লইতে হয়। লাঙ্গল বা ট্রাকটারের সাহায্যে ইহা সহজেই সম্ভব। জমিতে বারংবার লাঙ্গল দিলে উহার মাটি ঝরঝরে হয়। এই মাটির মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম খুব সহজ হয় এবং চারা গাছ অতি সহজেই এই মাটি হইতে তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

বীজ বপনের সময়ই জমিতে সার মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং মইয়ের সাহায্যে জমির অসমান মাটি সমান করিয়া লওয়া হয়। অসমান জমিতে ফসল ভাল হয় না।

বীজ বপনের পূর্বেই জমির চারিদিকে আল বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহার ফলে জমিতে বৃষ্টির জল জমিয়া জমিকে সরস করে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আবার জল যাহাতে বেশী না জমে, সেই

দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। জমিতে বেশী জল জমিলে নালা



চিত্র 18. কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি : মই, কোদাল, লাঙ্গল, কাস্তে, বিদে, নিড়ানি ইত্যাদি

কাটিয়া সেই জল বাহির করিয়া দিতে হয়, নচেৎ চারাগাছ জলে ডুবিয়া যায়, উহার শিকড় পচিয়া যায় এবং ফসলের ক্ষতি হয়।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. সার কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?
2. জৈব সার কাহাকে বলে? অজৈব সার কাহাকে বলে?
3. উদ্ভিদ মাটি হইতে কি কি খাদ্য পাইয়া থাকে? উহা বায়ু হইতে কি কি সংগ্রহ করে?
4. জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা করা কর্তব্য?
5. টীকা লিখ :
   (*a*) জলকৃষ্টি পরীক্ষা (*b*) পর্যায় ক্রমে চাষ (*c*) কম্‌পোস্ট সার।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
   (*a*) নানাপ্রকার —— পদার্থ হইতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়।
   (*b*) সবুজ সার জমিতে —— পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
   (*c*) কম্‌পোস্ট সার একপ্রকার —— সার।
2. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে √ এই দাগ দাও এবং যেগুলি শুদ্ধ নহে সেগুলির পাশে × এই দাগ দাও।
   (i) সবুজ সারে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকে।
   (ii) জমিকে উর্বর রাখিবার জন্য উহাতে পর্যায়ক্রমে চাষ করিতে হয়।
   (iii) বীজ বপনের পরে জমিতে সার দেওয়া উচিত।

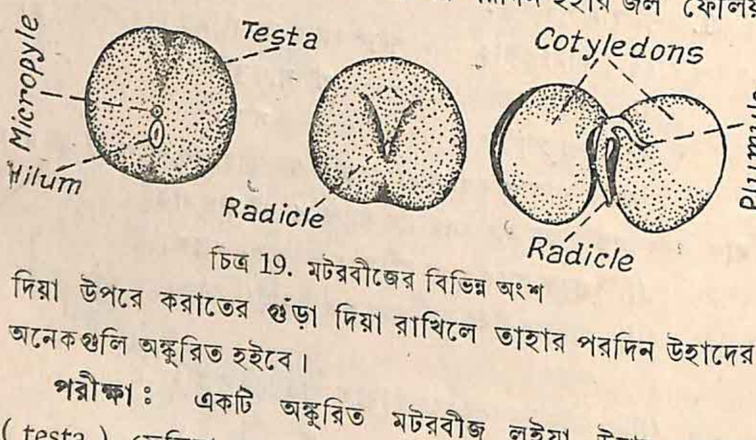
———

প্রথম পাঠ

1. মটরগাছের বিভিন্ন অংশ (A peaplant has different parts) ঃ

মটরবীজ (Pea) ঃ একটি শুষ্ক মটরবীজ লইয়া ভাল করিয়া দেখিলে উহার খোসার উপর একস্থানে একটি সাদা দাগ দেখিতে পাইবে। ঐ স্থানে মটরের শুঁটির সহিত বীজটি সংযুক্ত ছিল। উহাকে **প্রবীজ** বা **প্রধান নাভি** (Hilum) বলে। ইহার ঠিক উপরে একটি রন্ধ্র (Micropyle) রহিয়াছে।

মটরবীজ একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন ইহার জল ফেলিয়া



চিত্র 19. মটরবীজের বিভিন্ন অংশ

দিয়া উপরে করাতের গুঁড়া দিয়া রাখিলে তাহার পরদিন উহাদের অনেকগুলি অঙ্কুরিত হইবে।

পরীক্ষা ঃ একটি অঙ্কুরিত মটরবীজ লইয়া উহার খোসা (testa) ফেলিয়া দাও। দেখিবে বীজটি অঙ্কুরের দুই পাশে ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে খুব পাতলা কাগজের মত একটি অংশ দেখা যাইতেছে। এই সমগ্র জিনিসটিকে মটরের ভ্রূণ (Embryo) বলে।

এই অঙ্কুর ভবিষ্যতে মূলে পরিণত হয়, তাই ইহাকে **ভাবীমূল** (Radicle) বলে। বীজের মধ্যে কাগজের মত পাতলা অংশটি ভবিষ্যতে কাণ্ডে রূপান্তরিত হয়, সেইজন্য ইহাকে **ভাবীকাণ্ড**

(Plumule) বলে এবং বীজ হইতে যে দুইটি ডাল বাহির হইল ঐগুলিতে উদ্ভিদ-শিশুর খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ঐগুলিকে **বীজপত্র** (Cotyledon) বলে। মটর, ছোলা, তেঁতুল প্রভৃতি উদ্ভিদের এইরূপ দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে বলিয়া ইহাদিগকে **দ্বিবীজপত্রী** উদ্ভিদ বলে।

মূল (Root) : আলগা মাটি বা করাতের গুঁড়া-ভর্তি একটি সরা লও। ইহাতে কয়েকটি মটরবীজ পুঁতিয়া তাহাতে জল ছিটাইয়া দাও। দুই-একদিনের মধ্যেই দেখিবে যে প্রথমে **ভাবীমূল** বাহির হইয়াছে। ইহা মাটির ভিতরে যায়। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া **প্রধান-মূল** হয়। ইহার গা হইতে ছোট ছোট মূল বাহির হয়। ইহাদিগকে **শাখামূল** বলে। ভাবীমূল বাহির হইবার কয়েকদিন পরে **ভাবীকাণ্ড** বাহির হয়। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া **প্রধান কাণ্ড** হয়। ইহার গা হইতে **শাখা-প্রশাখা** ও **পাতা** বাহির হয়। চারাগাছ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরু বীজপত্র দুইটি খসিয়া পড়ে। মটরগাছের বীজপত্র মাটির নীচেই থাকিয়া যায়। তেঁতুল, কুমড়া প্রভৃতি গাছের বীজপত্র মাটির উপরে উঠিয়া আসে।



চিত্র 20. মটরগাছের কাণ্ড, পত্র, উপপত্র
(ক) আকর্ষ, (খ) ফুলের কুঁড়ি ও (গ) ফল বা শুটি

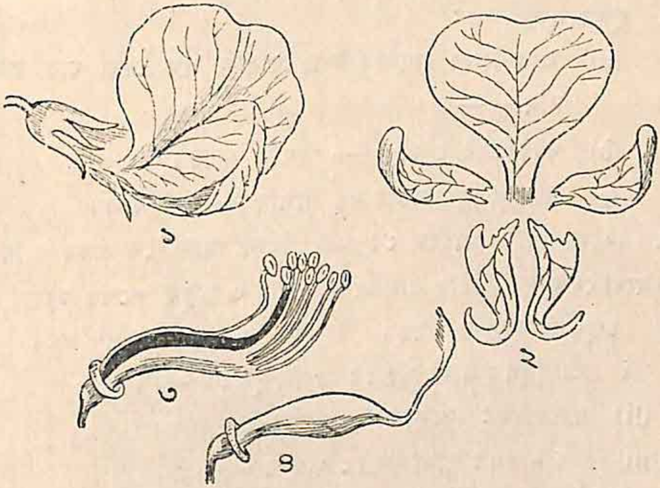
কাণ্ড (Stem) : মটরগাছ লতানে গাছ। মটরগাছের কাণ্ড সবুজবর্ণের, গোলাকার, নরম ও দুর্বল। সেইজন্য ইহার পাতার অগ্রভাগ আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। এই আকর্ষের সাহায্যে মটরগাছ বাঁশের কঞ্চি প্রভৃতি জড়াইয়া সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

কাণ্ডের যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে **গাঁইট** বলে। দুই গাঁইটের মধ্যের অংশকে **পাব** বলে। পাতা ও গাঁইটের সংযোগস্থলকে **কক্ষ** বলে। প্রত্যেক কক্ষে একটি মুকুল বা কুঁড়ি বাহির হয়। ইহাদিগকে **কক্ষমুকুল** (axiliary bud) বলে। কাণ্ডের আগার মুকুলকে **মাথার মুকুল** (terminal bud) বলে। কক্ষমুকুলের বৃদ্ধিতে ডালপালা হয় এবং মাথার মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড লম্বা হয়।

পাতা (Leaf) : মটরগাছের প্রত্যেক পাতার তিনটি অংশ আছে ; যথা—আগায় পত্রের চওড়া সবুজ ও পাতলা অংশ বা **ফলক** (leaf blade), মধ্যে সরু অংশ বা **বোঁটা** (leaf stalk) এবং নীচে **বেষ্টনী**। মটরের পাতায় একাধিক অনুফলক থাকে। ইহাকে **যৌগিক পত্র** (compound leaf) বলে। দুইটি অনুফলক পালকের মত কক্ষের দুই পাশে সাজান থাকে। ইহার পাতায় জালের মত শির আছে। প্রত্যেক কাণ্ড এবং শাখার সংযোগস্থলে দুই পার্শ্বে দুইটি **উপপত্র** (stipule) থাকে।

ফুল (Flower) : মটরের ফুল দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত। ফুলের সবচেয়ে উপরের অংশ বা **বৃতি** (sepal) সবুজবর্ণের ও বাটির মত। বৃতির ভিতরের স্তবক বা **দল** নীলবর্ণের। দলের অংশকে **পাপড়ি** (petal) বলে। দলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি থাকে। সকলের বড় পাপড়িকে **পতাকা** বলে। ইহার দুইপাশে দুইটি ডানার মত পাপড়িকে **পক্ষ** বলে। পক্ষের ভিতরকার দুইটি পাপড়ি সামান্য জোড়া থাকে। ইহাকে **নৌকা** বলে। ফুলের তৃতীয় স্তবককে **পুংকেশর** (stames) বলে। মটরফুলে নৌকার ভিতরে দশটি পুংকেশর আছে। ইহাদের মধ্যে নয়টির সূত্র মিলিয়া একটি নলের মত হইয়াছে। দশমটি সম্পূর্ণ পৃথক। ফুলের চতুর্থ স্তবককে **গর্ভকেশর** (carpel) বলে। মটরফুলে একটিমাত্র গর্ভকেশর আছে। গর্ভকেশরের নীচের মোটা অংশ বা

গর্ভকোষ একটু লম্বা ধরনের, মাঝের সরু অংশ বা **গর্ভদণ্ড** লম্বা,



চিত্র 21. মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ : ১। সম্পূর্ণ ফুল, ২। দলের বিভিন্ন অংশ, ৩। নয়টি পরাগকেশরের সূত্র মিলিত ও একটি পৃথক, ৪। গর্ভকেশর।

এবং উপরের পাতার ন্যায় অংশ বা **গর্ভমুণ্ড** আঠালো। পুংকেশরের উপরের অংশকে **পরাগকোষ** বলে।

ফল ও বীজ (Fruit and Seed) : মটরের ফল শুঁটির আকারে গাছে ফলে। শুঁটির ভিতর তিন-চারটি মটরের দানা থাকে। এই ফল শুকাইলে খোসা ফাটিয়া যায় এবং বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বীজ হইতে নূতন চারাগাছ জন্মে।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. মটর গাছের প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির নাম কর ও উহাদের বিবরণ দাও।
2. মটর ফুলের বিভিন্ন অংশগুলির বর্ণনা লিখ।
3. টীকা লিখ :

   বীজপত্র, কক্ষমুকুল, যৌগিক পত্র, গর্ভকেশর, পুংকেশর।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(*a*) মটরবীজের খোসার উপর যে সাদা দাগ দেখা যায় তাহার নাম ——।

(*b*) মটরফুলের মোট —— পাপড়ি আছে।

(*c*) মটরফুলের সবচেয়ে বড় পাপড়িকে —— বলে।

2. নিম্নের প্রতি লাইনে :: এই চিহ্নের বামদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক, উহার ডানদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দের মধ্যে সেই সম্পর্ক। চতুর্থ স্থানটি শূন্য আছে। উহা উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর।

(i) ভাবীমূল : ভাবীকাণ্ড : : প্রধান মূল : ——।

(ii) গর্ভকেশর : গর্ভকোষ : : পুংকেশর : ——।

(iii) প্রধান মূল : শাখা মূল : : শাখা : ——।

———

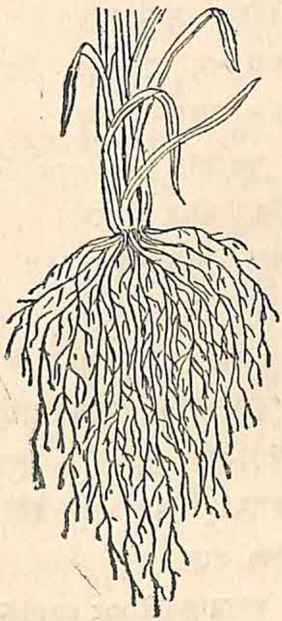
দ্বিতীয় পাঠ

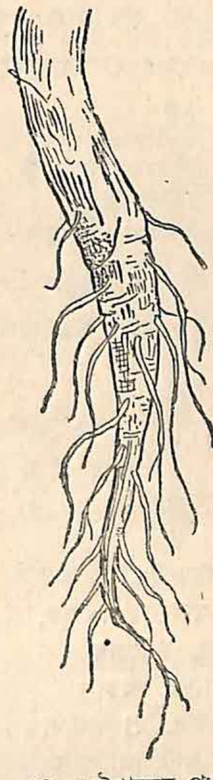
2. মূলের গঠন ও মূলের কার্য (Structure of root adapted to its functions) :

মূল (Root) : গাছের যে অংশ মাটির নীচে প্রোথিত থাকে, উহাকে সাধারণতঃ **মূল** বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড বরাবর যে অংশ মাটির মধ্যে থাকে, উহা উদ্ভিদের **প্রধান মূল** (main root)। প্রধান মূলটি কাণ্ডের গোড়ার নিকট যথেষ্ট স্থূল থাকে কিন্তু পরে ক্রমশঃ সরু হইয়া মাটির ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। প্রধান মূল হইতে মাটির নীচে চতুর্দিকে যে সকল ক্ষুদ্র মূল বাহির হয়, ঐগুলিকে **শাখামূল** (branch root) বলে।

কোন কোন গাছের প্রধান মূল অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায় ; তখন উদ্ভিদের কাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে কতকগুলি সূ ার মত সরু

সরু মূল বাহির হয়। এই জাতীয় মূলকে **গুচ্ছমূল** বলে। ধান, ভুট্টা প্রভৃতি গাছের মূলগুলি এই জাতীয় মূল। সাধারণতঃ একবীজ-পত্রী গাছে এই প্রকার গুচ্ছমূল দেখা যায়।



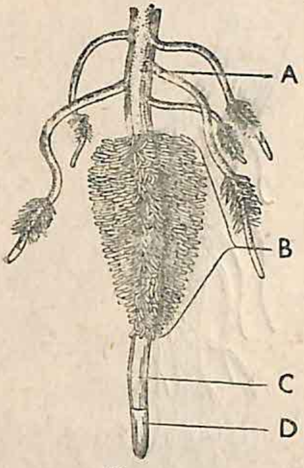


চিত্র 22. ধানগাছের গুচ্ছমূল চিত্র 23. নটেগাছের প্রধান মূল

মূলের প্রকারভেদ (Different kinds of root) : সাধারণতঃ দুই প্রকার মূল দেখা যায় ; (i) **স্থানিক মূল** এবং (ii) **অস্থানিক মূল**।

স্থানিক মূল বা **সাধারণ মূল :** ভ্রূণমূল হইতে গঠিত মূলটিকে বলা হয় **প্রাথমিক মূল** বা **প্রধান মূল** (Main root)। এই প্রধান মূল হইতে পরে শাখামূল জন্মায়। ভ্রূণমূল হইতে জন্মায় বলিয়া ইহার নাম স্থানিক মূল।

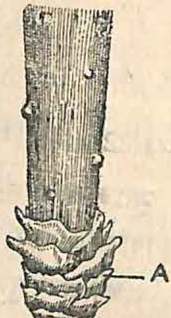
অস্থানিক মূল (Adventitious root) : ভ্রূণমূল হইতে না জন্মাইয়া উদ্ভিদের অন্য কোন অংশ হইতে যে মূল জন্মায় তাহাকে **অস্থানিক মূল** বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এমন কি পত্র হইতেও এই অস্থানিক মূল জন্মাইতে দেখা যায়। ধান, ভুট্টা প্রভৃতি গাছের যে গুচ্ছমূলের কথা বলা হইয়াছে—উহাও এক প্রকার অস্থানিক মূল।



চিত্র 24.
মৃত্তিকার মধ্যে প্রধান মূল, শাখামূল, মূলরোম ও মূলত্রাণের অবস্থান
A স্থায়ী অঞ্চল, B মূলরোম অঞ্চল, C বর্ধনশীল অঞ্চল, D মূলত্রাণ

মূলরোম (Root hair) : মাটির নীচে মূলের অগ্রভাগে আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র কোমল লোমের মত অংশ রহিয়াছে। এইগুলিকে **মূলরোম** বলে। এই মূলরোমগুলির গায়ে মাটির কণা আটকাইয়া থাকে। মূলরোমের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি হইতে রস শোষণ করে।

মূলত্রাণ (Root cap) : মূলের অগ্রভাগ সাধারণতঃ অত্যন্ত কোমল। এই মূলাগ্রভাগ বেষ্টন করিয়া টুপির ন্যায় একটি ঢাকনা থাকে। এই ঢাকনাটিকে **মূলত্রাণ** বলে। নরম মূলাগ্র যখন কঠিন মাটি ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় তখন এই মূলত্রাণটি উহাকে রক্ষা করে। মূলত্রাণ হইতে এক প্রকার আঠাল পদার্থ বাহির হওয়ায়



চিত্র 25. কেয়াগাছের মূল ও মূলত্রাণ
A বহুযোজী মূলত্রাণ

উহা পিচ্ছিল থাকে এবং সেইজন্য মূলাগ্রভাগ অনায়াসে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। জলজ উদ্ভিদে মূলাগ্রভাগ কঠিন মাটি ভেদ করে না বলিয়া সচরাচর ইহাদের মূলত্রাণ থাকে না। আবার পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল উদ্ভিদকে অত্যন্ত কঠিন মাটি ভেদ করিতে হয়, সেই সকল উদ্ভিদের মূলত্রাণ বেশ পুরু হয়।

মূলের কাজ (Functions of root)

(*a*) **মূল উদ্ভিদকে মাটির সহিত আটকাইয়া রাখে** (Roots anchor plants) : উদ্ভিদের মূল খাদ্যের সন্ধানে চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া মাটির মধ্যে অনেক দূর প্রোথিত থাকে। পৃথিবীর অভিকর্ষ-শক্তির জন্যও মূল নিম্নগামী হয়। ইহার ফলে উদ্ভিদ মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে।

(*b*) **মূল মাটি হইতে মূলরোমের সাহায্যে জল ও খাদ্য-রস শোষণ করিয়া উদ্ভিদের খাদ্য সংগ্রহ করে** (Roots absorb water and minerals by root hair) : উদ্ভিদ মাটি হইতে কঠিন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। মৃত্তিকার রসে দ্রবীভূত খাদ্যোপাদানই উদ্ভিদ **অস্‌মোসিস্‌** প্রক্রিয়া দ্বারা গ্রহণ করে।

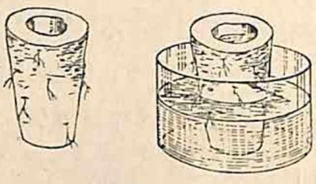
অস্‌মোসিস্‌ (Osmosis) : একটি কিস্‌মিস্‌ কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা ফুলিয়া উঠে। টাট্‌কা আঙ্গুর ঘন শরবতে ডুবাইয়া রাখিলে পরে উহা চুপসাইয়া যায়। আঙ্গুর বা কিস্‌মিসের খোসার ভিতর দিয়া জল যাতায়াত করিতে পারে।

যখন একটি গাঢ় দ্রবণ এবং অপর একটি পাতলা দ্রবণকে একটি ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা হয়, তখন দেখা যায় যে পাতলা দ্রবণ হইতে গাঢ় দ্রবণের দিকে পর্দার মধ্য দিয়া জল যাইতেছে। এই প্রক্রিয়াকে **অস্‌মোসিস্‌** (Osmosis) বলে।

যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটি তরলের ঘনত্ব একপ্রকার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অস্‌মোসিস্‌ চলিতে থাকে।

পরীক্ষা : একটি বড় গাজর লইয়া উহার দুই দিক এমনভাবে সমান্তরাল করিয়া কাট যাহাতে গাজরটিকে একটি জলের পাত্রে সোজাভাবে বসান যাইতে পারে। গাজরটির নীচের অর্ধাংশের, অর্থাৎ যে অংশটুকু জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে, খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এইবার গাজরের উপরের দিকের মাঝখানে ছুরি দিয়া একটি গর্ত কর। এখন গর্তটির মধ্যে কিছু ঘন চিনির জল ঢাল।

কিছুক্ষণ জলের মধ্যে এইভাবে গাজরটিকে রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, গাজরের গর্তটি ক্রমে ক্রমে চিনির জল দ্বারা পূর্ণ হইতেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই জল গর্ত উপচাইয়া পড়িবে।



চিত্র 26.
গাজর দ্বারা অস্‌মোসিস্ পরীক্ষা

এই পরীক্ষা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, অস্‌মোসিস্ প্রক্রিয়া দ্বারা পাত্রের জল গাজরের মধ্য দিয়া গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং গর্তের জলের পরিমাণ ও উচ্চতা বাড়াইয়া দিতেছে।

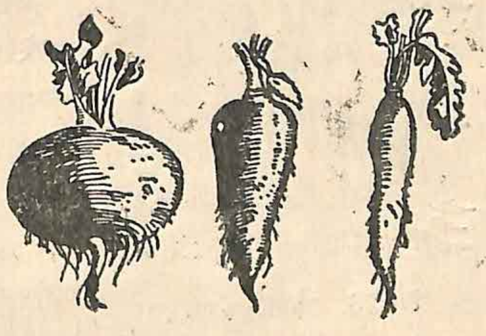
এই প্রকারের অস্‌মোসিস্ উদ্ভিদের মূলেও হইয়া থাকে। উহার মূলরোমের সেলুলোজ-নির্মিত কোষপ্রাচীরগুলি ভেদ্য পর্দার ন্যায় কাজ করে। মূলরোমের যে কোষগহ্বর আছে তাহার কোষ-রসে (Cell sap) প্রচুর দ্রবণীয় লবণ থাকায় মাটিতে অবস্থিত জল অপেক্ষা উহা বেশী গাঢ়। মাটির জল এবং কোষরসের মধ্যে অর্ধভেদ্য (semi-permeable) পর্দার ন্যায় একটি পর্দা আছে। ইহার ফলে অস্‌মোসিস্-প্রক্রিয়ায় মাটির জল মূলরোমের কোষ-গহ্বরে প্রবেশ করে। অতঃপর কোষের ভিতরকার চাপের (Root pressure) ও উপর হইতে শোষণের (suction) ফলে খাদ্যরস মূলরোম হইতে মূলে, মূল হইতে **জাইলেম** (Xylem) নামক সূক্ষ্ম নালিকা দিয়া কাণ্ডে এবং কাণ্ড হইতে ধীরে ধীরে পাতায় পৌঁছায়।

(c) **কোন কোন উদ্ভিদের মূলে ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে** (Food accumulated in certain roots) :

কোন কোন উদ্ভিদের প্রধান মূল অনেক সময় ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই খাদ্যসঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূল স্থূল হইয়া নানা প্রকার আকার ধারণ করে। আকৃতি অনুসারে এই সকল মূলের বিভিন্ন নাম হইয়াছে।

মোচাকৃতি (Fusiform) : যখন খাদ্যসঞ্চয়ের ফলে উদ্ভিদের প্রধান মূলের মধ্যভাগ স্ফীত হয় এবং উহার উপরের ও নীচের অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া কতকটা পটল বা মোচার ন্যায় আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে মোচাকৃতি মূল বলে। **মূলা** এই জাতীয় মূল।

শাঙ্কবাকার (Conical) : এই প্রকার রূপান্তরিত প্রধান মূলের উপরের অংশ সর্বাপেক্ষা স্থূল হয় এবং নীচের অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া আসার ফলে সমগ্র মূলটি একটি শঙ্কুর আকার ধারণ করে। এইজন্য এই প্রকার মূলকে শাঙ্কবাকার মূল বলে। **গাজর** এই জাতীয় মূল।



চিত্র 27. শালগম, গাজর, মূলা

শালগমাকার (Napiform) : উদ্ভিদের প্রধান মূলে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার ফলে মূলটির উপরের অংশ স্ফীত হইয়া প্রায় গোলাকার হইয়া যায় এবং নীচের অংশ অকস্মাৎ সরু হইয়া যায়। এইজন্য এই প্রকার মূলকে শালগমাকার মূল বলে। **শালগম**, **বীট** প্রভৃতি এই জাতীয় মূল।

কয়েকটি অস্থানিক মূল ও উহাদের কার্য

(Some adventitious roots and their functions)

অস্থানিক মূল কাহাকে বলে, তোমরা জান। এখানে কয়েকটি অস্থানিক মূলের কার্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

উদ্ভিদকে অতিরিক্ত বলদানের জন্য কয়েক প্রকার অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ কার্যসাধনের জন্য ইহাদের নানাপ্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে।

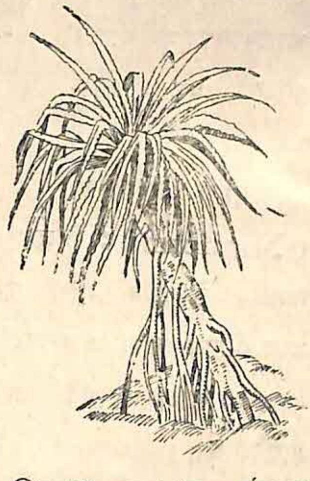
স্তম্ভমূল (Prop root) : বট, রবার প্রভৃতি গাছের শাখা-প্রশাখা হইতে কতকগুলি অস্থানিক মূল উৎপন্ন হইয়া সোজা নীচে নামিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। এই মূলগুলি পরে ক্রমশঃ মোটা হইয়া স্তম্ভের বা থামের আকার ধারণ করে। এইজন্য এই মূলকে **স্তম্ভমূল** বলে।



চিত্র 28. বটগাছের স্তম্ভমূল

স্তম্ভমূল গাছের বড়বড় সমান্তরাল শাখাগুলির ভার বহন করে।

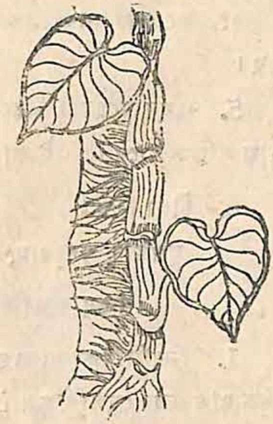
ঠেসমূল (Stilt root) : কেয়া প্রভৃতি গাছের প্রধান কাণ্ডটি অপেক্ষাকৃত সরু এবং দুর্বল। সেই-জন্য ইহাদের কাণ্ডের গোড়ায় চারি-দিকে কতকগুলি অস্থানিক মূল



চিত্র 29. কেয়াগাছের ঠেসমূল

উৎপন্ন হইয়া তির্যকভাবে নীচে নামিয়া আসে ও মাটিতে প্রবেশ করে। ইহারা ঠেস দিয়া গাছটিকে সোজা করিয়া রাখে। এইজন্য এই মূলকে **ঠেসমূল** বলে।

আরোহী মূল (Climbing root): পান, গজপিপুল প্রভৃতি কতকগুলি লতাগাছের পর্ব হইতে কিছুসংখ্যক অস্থানিক মুল উৎপন্ন হয়। এই মূলগুলির সাহায্যে এই সকল গাছ অন্য কোন বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আলো ও বাতাসের জন্য উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই প্রকার মূলকে **আরোহী মূল** বলে।



চিত্র 30.
গজপিপুলের আরোহী মূল

বায়বীয় মূল (Epiphytic root): রাস্না প্রভৃতি পরজীবী উদ্ভিদে এক প্রকার অস্থানিক মূল দেখা যায়। এই মূলগুলি বাতাসে ঝুলিয়া থাকে। এই মূলের সাহায্যে উদ্ভিদ বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। ইহাদিগকে বায়বীয় মূল বলে। এই সকল পরজীবী উদ্ভিদের প্রকৃত মূল আশ্রয়বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে।



চিত্র 31.
রাস্নার বায়বীয় মূল

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন: Essay Type

1. গাছের মূল কাহাকে বলে? উহার প্রধান প্রধান কাজ কি কি?
2. অস্থানিক মূল কাহাকে বলে? গাছের অস্থানিক মূল কোথায় জন্মে? গুচ্ছমূল কোন্ জাতীয় মূল? ঐ মূল কোন্ গাছে দেখা যায়?

3. "অস্‌মোসিস্" প্রক্রিয়া কাহাকে বলে ? অস্‌মোসিস্ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি পরীক্ষার বর্ণনা কর।

4. কয়েকটি অস্থানিক মূলের নাম কর এবং উহাদের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

5. এমন কয়েকটি উদ্ভিদের নাম কর যাহাদের মূলে ভবিষ্যতের জন্য উহার খাদ্য সঞ্চিত রাখে। এই জাতীয় মূল কত প্রকার ও কি কি ?

6. টীকা লিখ :

মূলত্রাণ, মূলরোম, প্রধান মূল, জাইলেম।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ সেগুলির পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও এবং যেগুলি ভুল সেগুলির পাশে × এই চিহ্ন দাও :

(i) মূলরোমের সাহায্যে মূল মাটি হইতে রস শোষণ করে।

(ii) মূলের দ্বারা উদ্ভিদ শ্বাসকার্য চালায়।

(iii) মূল মাটি হইতে যে রস শোষণ করে তাহাই উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খাদ্য।

(iv) মাটির মধ্যে কয়েক প্রকার লবণ থাকে, ঐগুলি জলে দ্রবীভূত হইলে অস্‌মোসিস্ প্রক্রিয়ায় মূল ঐ রস শোষণ করে।

2. বাম পার্শ্বের স্তম্ভে কতকগুলি গাছের নাম এবং দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভে কতকগুলি অস্থানিক মূলের নাম দেওয়া আছে। দুই স্তম্ভ হইতে দুইটি নাম লইয়া জোড়া মিলাও :

(i) কেয়া গাছ	স্তম্ভমূল।	(iii) পান গাছ	ঠেস মূল।
(ii) রাস্নাগাছ	আরোহী মূল।	(iv) বট গাছ	বায়বীয় মূল।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(i) ভ্রূণমূল হইতে না জন্মাইয়া উদ্ভিদের অন্য কোন অংশ হইতে যে মূল জন্মায় তাহাকে —— মূল বলে।

(ii) খাদ্যরস মূল হইতে —— নামক সূক্ষ্ম নালিকা দিয়া কাণ্ডে, এবং কাণ্ড হইতে পাতায় পৌছায়।

(iii) বীটের মূল —— এবং গাজরের মূল ——।

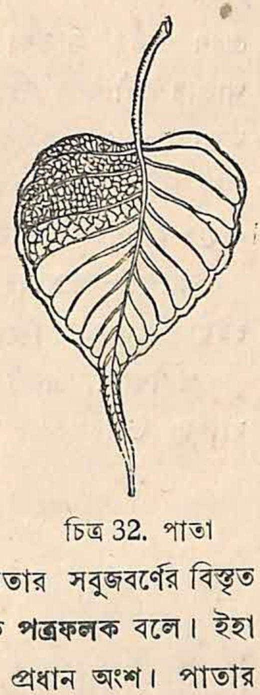
(iv) গজপিপুলের অস্থানিক মূলকে —— মূল বলে।

তৃতীয় পাঠ

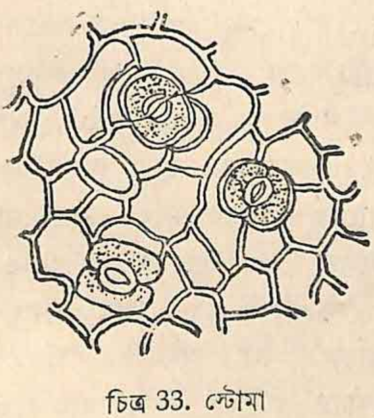
3. পাতার গঠন ও উহার কার্য (Structure of leaves are adapted to specialised functions) :

পাতার গঠন (Structure of leaf) : পাতা উদ্ভিদের এক অপরিহার্য অঙ্গ। ইহা একাধারে উদ্ভিদের নাসিকা, মুখগহ্বর, জঠর ও উদ্বৃত্ত জল-নির্গমন-পথ।

সাধারণতঃ পাতার তিনটি অংশ,—(i) **পত্রমূল** বা গোড়া (Leaf base) —যে অংশ কাণ্ড বা শাখা-সংলগ্ন থাকে ; (ii) **বৃন্ত** বা বোঁটা (Leaf stalk)—মধ্যবর্তী অংশ এবং (iii) **পত্রফলক** (Leaf blade)।



চিত্র 32. পাতা



চিত্র 33. স্টোমা

পাতার সবুজবর্ণের বিস্তৃত অংশকে **পত্রফলক** বলে। ইহা পাতার প্রধান অংশ। পাতার মধ্যে অসংখ্য সবুজকণা আছে বলিয়া উহা সবুজ দেখায়। পাতার বিস্তৃত কাঠামো রচনা করে উহার শিরা-উপশিরা-গুলি। পাতায়, বিশেষতঃ উহার নীচের দিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে। এইগুলিকে **স্টোমা** (Stoma) বলে। স্টোমার ছিদ্রপথেই শ্বাসকার্যের সময় বায়ুর সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

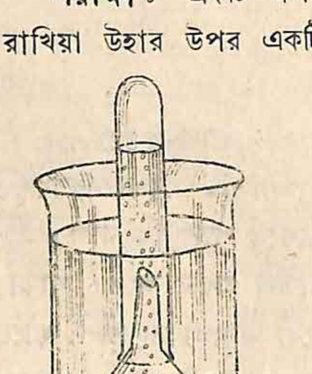
পাতার কার্য (Functions of leaves)

পাতার প্রধান প্রধান কার্য সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

(i) **অঙ্গার আত্তীকরণ বা সালোক-সংশ্লেষ** (Carbon assimilation or Photosynthesis) : অঙ্গার উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে উহা গ্রহণ করে। মৃত্তিকা হইতে মূলরোমের সাহায্যে সংগৃহীত রস পাতায় পৌঁছিলে উহার সহিত সূর্যালোকের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পাতার সবুজকণা এই কার্য পরিচালনা করে। ইহার ফলে উদ্ভিদের শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস মুক্ত হইয়া যায়।

সালোক-সংশ্লেষের সময় যে উদ্ভিদদেহ হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া আসে তাহা নিম্নের পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয়।

পরীক্ষা : একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্রে কিছু শেওলা ঝাঁঝি রাখিয়া উহার উপর একটি কাচের ফানেল উপুড় করিয়া বসাও। ফানেলটি যেন সম্পূর্ণভাবে জলের মধ্যে থাকে। এখন একটি জলপূর্ণ পরীক্ষা-নলের (test tube) মুখ বুড়ো আঙ্গুলের দ্বারা বন্ধ করিয়া পাত্রের জলের মধ্যে ফানেলের নলের উপর উপুড় করিয়া বসাও। পরীক্ষা-নলটি যেন সম্পূর্ণ জলপূর্ণ থাকে। এই অবস্থায় পাত্রটিকে রৌদ্রে রাখিলে দেখা যায় যে, শেওলা ঝাঁঝি হইতে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ বাহির হইয়া পরীক্ষা-নলের মধ্যে জমা হইতেছে।



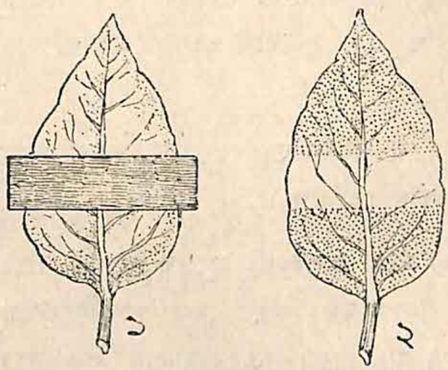
চিত্র 34. অঙ্গার আত্তীকরণে গাছের অক্সিজেন পরিত্যাগ

কিছু গ্যাস সঞ্চিত হইলে পরীক্ষা-নলের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা

বন্ধ করিয়া সাবধানে উহা জলের বাহিরে আন। এখন শিখাহীন একটি জ্বলন্ত কাঠি উহার মধ্যে ধরিলে কাঠিটি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, ঐ পরীক্ষা-নলের গ্যাস অক্সিজেন এবং শেওলা ঝাঁঝি উহা ত্যাগ করিয়াছে।

ফানেল ও পরীক্ষা-নলসহ পাত্রটিকে সূর্যালোক হইতে সরাইয়া অন্ধকারের মধ্যে রাখিলে পরীক্ষা-নলে আর গ্যাস সঞ্চিত হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ দিনের বেলা অক্সিজেন ত্যাগ করে, রাত্রিতে করে না।

সূর্যালোক ব্যতীত যে গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয় না, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়।



চিত্র 35. সূর্যালোকে অঙ্গার-আত্তীকরণ
(১) টিনের পাত-ঢাকা পাতা,
(২) টিনের পাত খুলিয়া আয়োডিনের দ্রবণে ডুবানোর পর

পরীক্ষা : সূর্যোদয়ের পূর্বেই কোন গাছের সবুজ পাতার কিয়দংশ একটি টিনের পাত দিয়া এরূপে মুড়িয়া দাও যেন আবৃত অংশে কোনক্রমেই সূর্যালোক না লাগে। দুইদিন পর পাতাটি তুলিয়া টিনের পাত খুলিয়া ফেল। পাতাটিকে অ্যালকোহলে (সুরাসারে) সামান্য তাপ প্রয়োগ করিলে পাতার সবুজ কণাগুলি বাহির হইয়া যাইবে। এইবার ঐ পাতাটিকে আয়োডিন-দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া ধরিলে দেখিবে যে, উহার যে অংশ ঢাকা ছিল তাহা পূর্ববৎ রহিয়াছে, কিন্তু উহার উভয় দিকের অবশিষ্ট অংশ বেগুনী

রংয়ের হইয়াছে ; কারণ আয়োডিনের সঙ্গে শ্বেতসারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইলে উহা বেগুনী রং ধারণ করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যালোকে পাতায় শ্বেতসার প্রস্তুত হয়, অন্ধকারে তাহা হয় না।

শ্বাসকার্য (Respiration) : প্রধানতঃ পাতার সাহায্যেই উদ্ভিদের শ্বাসকার্য চলে। পাতার রন্ধ্রপথে বায়ুর সহিত অক্সিজেন উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিলে উহাব সহিত পাতায় সঞ্চিত খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। উহার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় ; উহা নিশ্বাস-বায়ুর সহিত বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের এই শ্বাসকার্য দিবারাত্রিই চলে। ইহার জন্য সূর্যালোক বা পাতার সবুজকণার প্রয়োজন হয় না। উদ্ভিদ প্রধানতঃ পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাইলেও উহার সর্বদেহই শ্বাসকার্যে অল্পবিস্তর সাহায্য করে।

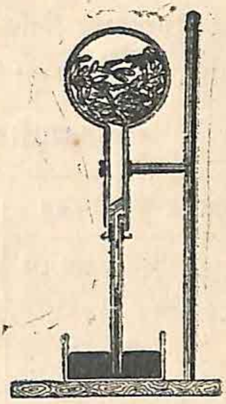
শ্বাসকার্যের সময় উদ্ভিদ যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে তাহা নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা : একটি ফ্লাস্কের মধ্যে কতকগুলি ফুলের পাপড়ি লও। ফ্লাস্কের মুখ আলগা তুলা দিয়া বন্ধ কর, যেন পাত্রটি উপুড় করিলে পাপড়িগুলি পড়িয়া না যায়। এইবার দুই এক খণ্ড কস্টিক পটাস চিমটার সাহায্যে তুলার উপরে ঐ ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ফ্লাস্কের মুখটি একটি ছিদ্রযুক্ত রবার-কর্ক দিয়া বন্ধ কর। কর্কের ছিদ্রপথে একটি কাচের নল প্রবেশ করাও।

এইবার আংশিকভাবে পারদপূর্ণ একটি কাচপাত্রের উপর নলসহ ফ্লাস্কটিকে উপুড় করিয়া রাখ। লক্ষ্য রাখিও, নলটি যেন পারদ-পাত্রের তলদেশ স্পর্শ না করে।

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিবে যে, ফ্লাস্কের নলে পারদের উচ্চতা

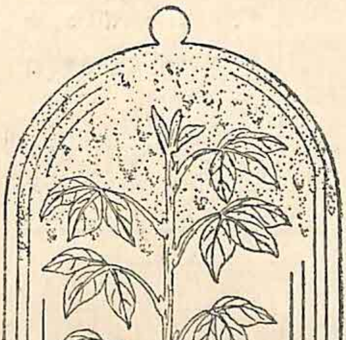
বাড়িয়াছে; কারণ শ্বাসকার্যের সময় পাপড়িগুলি যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করিয়াছে, তাহা কস্টিক পটাস দ্বারা শোষিত হওয়ায় ফ্লাস্কের মধ্যে বায়ুর চাপ কমিয়া গিয়াছে। ফলে বাহির হইতে পারদ নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।



চিত্র 36.
শ্বাসক্রিয়ার পরীক্ষা

ইহাতে প্রমাণিত হইল, শ্বাসকার্যের সময় উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে।

প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন (Transpiration): উদ্ভিদ মাটি হইতে যে রস শোষণ করে তাহার মধ্যে প্রচুর জল থাকে। এই জলের উদ্বৃত্ত অংশ পাতার রন্ধ্রপথে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকেই **প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন** (Transpiration) বলে।



চিত্র 37. উদ্ভিদের
প্রস্বেদন-প্রক্রিয়ার পরীক্ষা

নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা গাছের পাতার প্রস্বেদন-ক্রিয়া প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা: একটি টবের গাছকে বেশ কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখ। পরে গাছের গোড়ায় টবের মুখ রবারের পাতলা পর্দা দিয়া ঢাকিয়া দাও। এখন টবসহ গাছটিকে একটি কাচের বেলজার দিয়া ঢাকিয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, বেলজারের অভ্যন্তরে উহার গায়ে বিন্দু

বিন্দু জলকণা জমা হইয়াছে। পাতার প্রস্বেদন-ক্রিয়ার ফলে যে জল বাষ্পাকারে নির্গত হইয়াছে, তাহাই শীতল বেলজারের গায়ে লাগিয়া জলকণায় পরিণত হইয়াছে।

অঙ্গার-আত্তীকরণ, প্রস্বেদন ও শ্বাসকার্যের তুলনা

অঙ্গার-আত্তীকরণ	প্রস্বেদন	শ্বাসকার্য
1. সূর্যালোকে দিনে চলে।	1. দিনে বেশী, রাত্রে কম।	1. দিনরাত্রি চলে।
2. পাতার সবুজ অংশ দ্বারা চলে।	2. পাতার ছিদ্র-পথে চলে।	2. প্রত্যেক কোষ দ্বারা চলে।
3. বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড বিশ্লিষ্ট হয়। উদ্ভিদ কার্বন আত্ম-সাৎ করে। অক্সিজেন বায়ুতে মিশে।	3. উদ্ভিদের দেহ হইতে জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশে।	3. অক্সিজেনসমেত বায়ু দেহে ঢোকে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া যায়।
4. উদ্ভিদের ওজন বাড়ে।	4. উদ্ভিদের ওজন কমে।	4. উদ্ভিদের ওজন কমে।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. কোন একটি পাতার চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার বিভিন্ন অংশগুলির পরিচয় দাও।

2. পাতার কার্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

3. সালোক-সংশ্লেষ কাহাকে বলে? সালোক-সংশ্লেষকালে উদ্ভিদদেহ হইতে যে অক্সিজেন বাহির হয়, তাহার পরীক্ষা-মূলক প্রমাণ দাও।

4. সূর্যালোক ব্যতীত যে গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয় না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

5. শ্বাসকার্য কাহাকে বলে? শ্বাসকার্যের সময় উদ্ভিদের দেহ হইতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়, তাহার প্রমাণ দাও।

6. প্রস্বেদন-প্রক্রিয়া কাহাকে বলে? উদ্ভিদের পক্ষে প্রস্বেদন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

7. প্রস্বেদন-প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা বর্ণনা কর।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কয়েকটি ভুল, কয়েকটি শুদ্ধ; যেগুলি শুদ্ধ সেইগুলির পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও এবং যেগুলি ভুল সেইগুলির পাশে × এই চিহ্ন দাও।

(i) সূর্যালোকের অভাবে গাছের পাতা শ্বাসকার্য চালাইতে পারে না।

(ii) গাছের পাতার মধ্যে স্টোমা থাকে; সেই ছিদ্র দিয়া পাতার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

(iii) প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের ওজন বাড়িয়া যায়।

(iv) অন্ধকারেও বৃক্ষ অঙ্গার-আত্তীকরণ করিতে পারে।

(v) উদ্ভিদের প্রস্বেদন দিনে রাত্রে সমান চলে।

2. উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(i) পাতার সূক্ষ্ম ছিদ্রকে —— বলে।

(ii) অঙ্গার-আত্তীকরণ কেবলমাত্র —— বেলা হয়।

(iii) উদ্ভিদের শ্বাসকার্য এবং সালোক-সংশ্লেষ —— ক্রিয়া

চতুর্থ পাঠ

4. ফুল ও ফুলের কার্য (Flower and its functions) :

ফুল (Flower) : ফুল গাছের এক পরম সম্পদ। গাছের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যই যে ফুল ফোটে, তাহা নহে ; তাহার আরও এক গভীর উদ্দেশ্য আছে। গাছের বংশবৃদ্ধির পক্ষে ফুল তাহার প্রথম সোপান। কারণ, ফুল হইতেই ফল হয় ; ফলের মধ্যে বীজ থাকে এবং বীজ হইতে গাছ হয়।

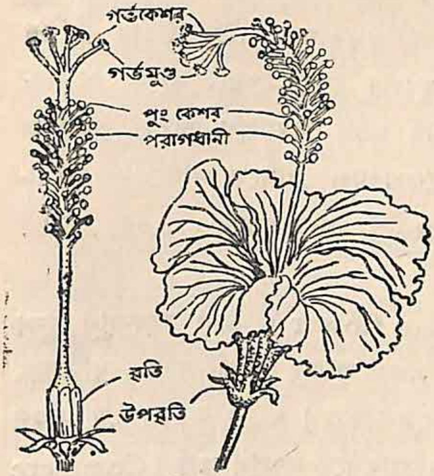
ফুলের গঠন : সাধারণ ফুলের চারিটি স্তবক বা চক্র থাকে,—(i) **বৃতিচক্র**, (ii) **দলচক্র**, (iii) **পুংকেশরচক্র** ও (iv) **গর্ভকেশরচক্র**।

(i) **বৃতিচক্র** (Calyx) : ফুলের সবচেয়ে নীচের স্তবককে বৃতিচক্র বলে। কোন কোন ফুলে বৃতিগুলি পৃথক, আবার কোন কোন ফুলে উহারা পরস্পর সংলগ্ন। ফুলের কুঁড়ি অবস্থায় বৃতি উহাকে বাহিরের শীতাতপ হইতে রক্ষা করে।

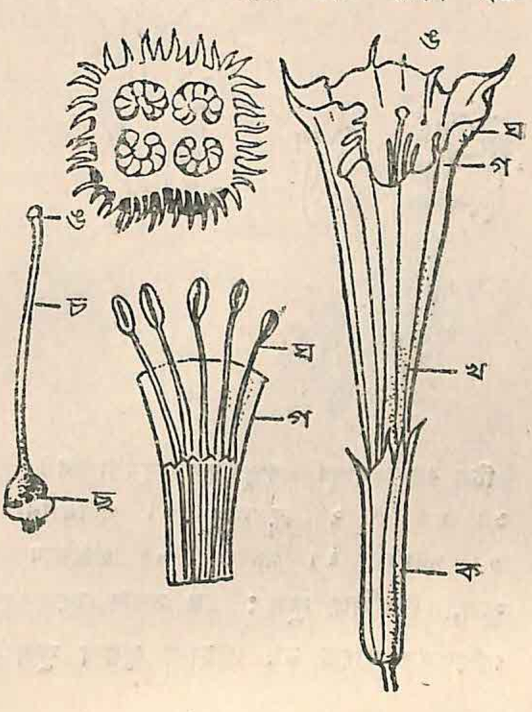
(ii) **দলচক্র** (Corolla)—বৃতির পরের স্তবককে দলচক্র বলে। ফুলের পাপড়ি উহার দলচক্রের অংশ। পাপড়ির বর্ণ ও গন্ধ সকলকে আকৃষ্ট করে। কোন কোন ফুলের দলগুলি পৃথক, আবার কোন কোন ফুলে উহারা পরস্পর সংলগ্ন। দলচক্রের রূপে ও গন্ধে মৌমাছি ও কীটপতঙ্গ ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরোক্ষভাবে ফুলের গর্ভাধানে সাহায্য করে।

(iii) **পুংকেশরচক্র** (Androecium)—ইহা ফুলের তৃতীয় স্তবক। এই স্তবকের প্রত্যেক অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশর দেখিতে দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত, নীচে দীর্ঘ সূত্র এবং মাথায় পরাগরেণুতে পূর্ণ পরাগকোষ। কোন ফুল স্পর্শ করিলে হাতে যে হলদে রং-এর গুঁড়া লাগে, সেইগুলিই পরাগরেণু। পুংকেশর পুষ্ট হইলে পরাগকোষ ফাটিয়া পরাগরেণু বাহির হইয়া পড়ে। প্রত্যেক পরাগরেণুর মধ্যে পুং-জননকোষ থাকে।

(iv) **গর্ভকেশরচক্র** (Gynœcium)—পুংকেশরচক্রের বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ফুলের কেন্দ্রস্থলে গর্ভকেশরচক্র অবস্থিত। ইহা ফুলের চতুর্থ স্তবক। গর্ভকেশরচক্রের এক-একটি অংশকে গর্ভকেশর বলে। গর্ভকেশরের তিনটি অংশ, (*a*) **গর্ভমুণ্ড,**—উপরের গোলাকার মস্তক; (*b*) **গর্ভদণ্ড,**—মধ্যবর্তী সরু নলের মত দীর্ঘ অংশ এবং (*c*) **গর্ভকোষ,**—সকলের নীচে স্ফীত অংশ। গর্ভ-



চিত্র 38. জবাফুলের বিভিন্ন অংশ

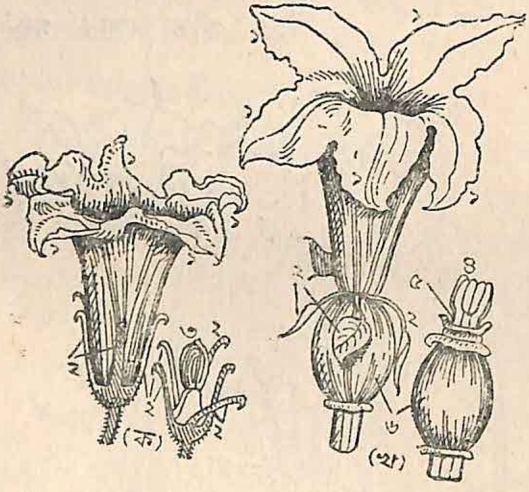


চিত্র 39.
ধুতুরাফুল ও তাহার বিভিন্ন অংশ :
ক—বৃতি,
খ—দল,
গ—সূত্র,
ঘ—পরাগকোষ,
ঙ—মুণ্ড,
চ—গর্ভদণ্ড,
ছ—গর্ভকোষ

কোষের অভ্যন্তরে ডিম্বকোষ থাকে এবং ডিম্বকোষের অভ্যন্তরে ডিম্বক বা স্ত্রী-জননকোষ থাকে।

একটি জবাফুল কিংবা একটি ধুতুরাফুল লইয়া উহার বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ কর। জবাফুলের ক্ষেত্রে পরাগকোষের ঝালর-দেওয়া মধ্যবর্তী পুংকেশরচক্রের দণ্ডটি লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিলে ভিতরে মোটা সূতার মত গর্ভকেশরদণ্ড দেখিতে পাইবে। ধুতুরা-ফুলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সূত্রদণ্ডটিই গর্ভকেশরদণ্ড। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়।

সম্পূর্ণ পুষ্প (Complete flower) এবং **অসম্পূর্ণ পুষ্প** (Incomplete flower) : সকল ফুলের চারিটি স্তবক (বৃতিচক্র, দলচক্র, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র) থাকে না। যে সকল ফুলের চারিটি স্তবকই আছে তাহাদিগকে **সম্পূর্ণ ফুল** (Complete flower) বলে। জবা, মটর, ধুতুরা প্রভৃতি ফুল এই শ্রেণীভুক্ত। আবার লাউ, কুমড়া, পেঁপে প্রভৃতি ফুলে একটি চক্রের বা স্তবকের অভাব থাকে। ইহাদিগকে **অসম্পূর্ণ ফুল** (Incomplete flower) বলে।



চিত্র 40. অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ ফুল (কুমড়া ফুল)
১। দল ২। বৃত্যংশ ৩। পরাগধানী
৪। গর্ভমুণ্ড ৫। গর্ভদণ্ড ৬। গর্ভকোষ

পুরুষ ফুল, স্ত্রী ফুল, উভলিঙ্গ ফুল : যে সকল ফুলে পুংকেশর থাকে অথচ গর্ভকেশর থাকে না, তাহারা **পুরুষ ফুল** এবং যে সকল ফুলে

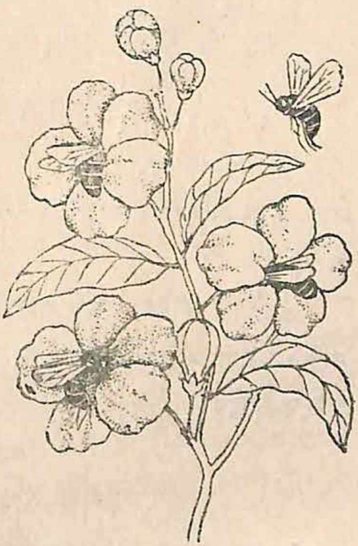
গর্ভকেশর থাকে অথচ পুংকেশর থাকে না তাহারা **স্ত্রী-ফুল**। ইহারা **একলিঙ্গ** পুষ্প। আর যে ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে, তাহাকে **উভলিঙ্গ** ফুল বলে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছে পুরুষ-ফুল এবং স্ত্রী-ফুল উভয়ই দেখা যায়। জবা, ধুতুরা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফুলগুলি উভলিঙ্গ ফুল।

ফুলের কার্য (Functions of flower)

ফুলের গঠনবৈচিত্র্যে, বর্ণে, গন্ধে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, উদ্ভিদের বংশরক্ষার পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ফলে পরিণতির মধ্যেই ফুলের সার্থকতা। ফুল হইতে ফল হয়। ফলের মধ্যে বীজ থাকে। বীজ হইতে নূতন গাছ হয়। সুতরাং উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিই ফুলের প্রধান কাজ।

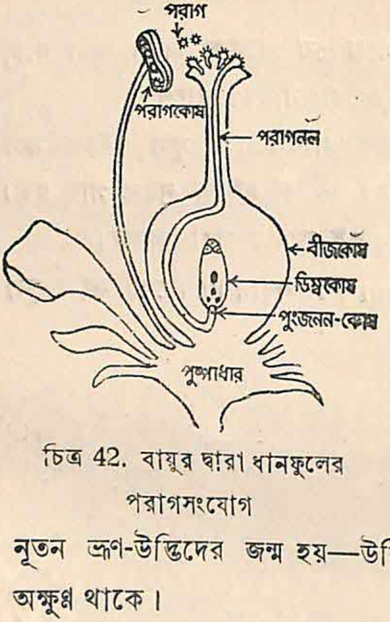
পরাগসংযোগ (Pollination): পরাগসংযোগের ফলে ফুল হইতে ফল জন্মে। এই কার্যে কীটপতঙ্গাদি উদ্ভিদকে সাহায্য করে। ফুলের উজ্জ্বল বর্ণ, সুমিষ্ট গন্ধ কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। ফুলের অভ্যন্তরস্থ মধু উহাদিগকে প্রলুব্ধ করে। কীটপতঙ্গ যখন মধু আহরণের জন্য এক ফুল হইতে অন্য ফুলে উড়িয়া বেড়ায়, কিংবা যখন কোন ফুলে মধু পান করিতে ব্যস্ত থাকে, তখন উহাদের দেহে অসংখ্য পরাগরেণু লাগিয়া যায়। সেই অবস্থায় উহা যখন একই জাতীয় অন্য কোন ফুলে বসে, তখন ঐ সকল



চিত্র 41. মৌমাছি দ্বারা পরাগসংযোগ

পরাগরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডের আঠায় আটকাইয়া যায়। ইহাকে **পরাগসংযোগ** বলে।

নিষিক্তকরণ (Fertilization) : গর্ভমুণ্ডের রসে পরাগগুলি সিক্ত হইলে উহাদের দেহ হইতে ছোট ছোট পরাগনল বাহির হয়। পরাগনল গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে গর্ভকোষে পৌঁছে। পরে উহা ডিম্বকরন্ধ্র ভেদ করিয়া ডিম্বকোষে প্রবেশ করে। এই সময় পরাগনলটি ফাটিয়া যায় এবং ভিতরের পুং-জননকোষ মুক্ত হইয়া পড়ে। তখন স্ত্রী-জননকোষের সহিত উহার মিলন হয়। উহাকে **নিষিক্তকরণ** বলে। নিষিক্তকরণের ফলে গ র্ভ কো ষ ফলে, গর্ভকোষের প্রাচীর ফলের খোসায় এবং ডিম্বকোষ বীজে পরিণত হয়। বীজের মধ্যে নূতন ভ্রূণ-উদ্ভিদের জন্ম হয়—উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ও বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে।



চিত্র 42. বায়ুর দ্বারা ধানফুলের পরাগসংযোগ

একমাত্র কীটপতঙ্গের দ্বারাই যে ফুলের পরাগসংযোগ হয়, তাহা নহে। বায়ু, জল এবং অন্যান্য প্রাণীর দ্বারাও এই পরাগসংযোগ হইতে পারে।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. জবাফুলের বিভিন্ন অংশগুলি চিত্রসাহায্যে বর্ণনা কর। সম্পূর্ণ ফুল ও অসম্পূর্ণ ফুল কাহাকে বলে?

2. বৃতিচক্র ও দলচক্র ফুলের কি কি কাজ করে?

3. পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র ফুলের কি কি কাজ করে?
4. টীকা লিখ :
একলিঙ্গ পুষ্প, উভলিঙ্গ পুষ্প, স্ত্রী পুষ্প এবং পুং পুষ্প।
5. পরাগসংযোগ কাহাকে বলে? উহা কিভাবে নিষ্পন্ন হয়?
6. নিষিক্তকরণ কিভাবে সম্পাদিত হয় তাহা বুঝাইয়া লিখ।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও এবং যেগুলি ভুল তাহাদের পাশে × এই চিহ্ন দাও।

(i) সকল ফুলেই পুংকেশর ও গর্ভকেশর আছে।

(ii) সম্পূর্ণ ফুলমাত্রেই উভলিঙ্গ পুষ্প।

(iii) ফুল হইতে ফল জন্মিবার জন্য কেবল পরাগসংযোগ হইলেই চলে না, নিষিক্তকরণও আবশ্যক।

2. উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(i) পেঁপে গাছের ফুল — ফুল।

(ii) পতঙ্গ ফুলের — ঘটিতে সাহায্য করে।

(iii) উদ্ভিদের — ফুলের প্রধান কাজ।

(iv) জবাফুলের দলগুলি — কিন্তু ধুতুরাফুলে উহারা —।

———

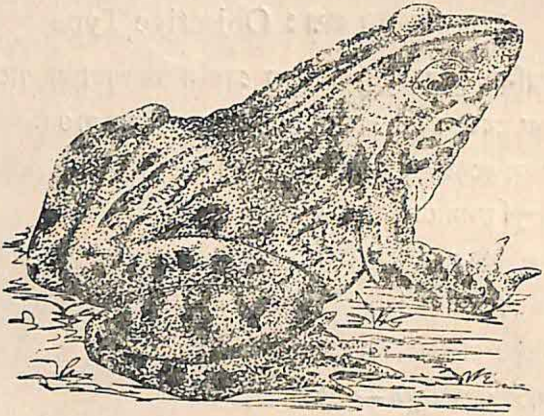
পঞ্চম পাঠ

5. কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ-এর বহিরাকৃতি এবং উহাদের কার্যাবলী (External features of frog and toad and their functions) :

কোলা ব্যাঙ (Frog) : কোলা ব্যাঙ সাধারণতঃ কোন জলাশয়ের ধারে বা জলাভূমির আশেপাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাস করে। ইহারা কুনো ব্যাঙ-এর তুলনায় বড় এবং ইহারা কুনো ব্যাঙ-এর মত কদাকার নহে। কোলা ব্যাঙ ও কুনো

ব্যাঙ-এর দেহের বহিরাকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। কোলা ব্যাঙ মেরুদণ্ডী উভচর প্রাণী।

কোলা ব্যাঙ-এর পিঠের দিকের রং গাঢ় সবুজ এবং পেটের দিকের রং হালকা হলদে। ইহাদের পিঠের মধ্যরেখা ধরিয়া



চিত্র 43. কোলা ব্যাঙ

একটি সাদা ডোরা লম্বালম্বিভাবে মাথা হইতে প্রসারিত। ইহার দুই পার্শ্বে আরও কয়েকটি সাদা সাদা ডোরা আছে।

কোলা ব্যাঙ-এর গায়ের চামড়া খুব মসৃণ। ইহাদের পেট বা পিঠের দিকে ওয়ার্ট (wart) নাই। ইহাদের মাথার সম্মুখ-ভাগ কুনো ব্যাঙ-এর মাথার তুলনায় সরু এবং ইহাদের মুখবিবরের উপরের চোয়ালে এক পাটি দাঁত আছে। উহাদের জিহ্বা সম্মুখের দিকে নীচের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পিছনের দিকে উহা আলগা থাকে। এইজন্য উহারা জিহ্বা উল্টাইয়া বাহিরে আনিতে পারে। কোন জীবন্ত পোকামাকড় দেখিলে উহারা জিহ্বা উল্টাইয়া ঐ পোকার উপর লাগাইলে উহাদের জিহ্বা হইতে একপ্রকার আঠালো রস নির্গত হয়। ঐ রসে পোকা আটকাইয়া যায়। তখন উহারা জিহ্বা ভিতরে লইয়া গেলে পোকা একেবারে গলার ভিতরে চলিয়া যায়।

ইহাদের দেহে প্যারটিড গ্রন্থি নাই। ইহারা বসিয়া থাকিলে ইহাদের পিছনের দিকে পিঠের উপর সামান্য একটু কুঁজ দেখা যায়।

কুনো ব্যাঙ-এর পায়ের তুলনায় কোলা ব্যাঙ-এর পাগুলি বেশী লম্বা। এইজন্য ইহারা কুনো ব্যাঙ-এর তুলনায় অনেক বেশীদূর লাফাইয়া যাইতে পারে। ইহাদের পশ্চাৎপদের আঙ্গুলগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পর্দার দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহারা কুনো ব্যাঙ অপেক্ষা ভাল সাঁতার কাটিতে পারে।

কুনো ব্যাঙ (Toad) : কুনো ব্যাঙ উভচর শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী। কারণ ইহারা জলে এবং স্থলে, উভয় ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে পারে। কুনো ব্যাঙ অন্ধকার কোণে, মাটি বা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে এবং ডোবার ধারে লুকাইয়া থাকে। কুনো ব্যাঙ



চিত্র 44. কুনো ব্যাঙ

দেখিতে অতি কুৎসিত। ইহাদের সমস্ত দেহ আঁচিলের ন্যায় ছোট ছোট ওয়ার্ট (wart) দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া ইহাদের গায়ের চামড়া খস্‌খসে। ইহাদের দেহে পশুর ন্যায় লোম, পাখীর ন্যায় পালক কিংবা মাছের ন্যায় আঁশ প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহাদের পিঠের দিকের রং কালচে ধূসর, কিন্তু পেটের দিকের রং হালকা হলদে।

কুনো ব্যাঙ-এর দেহের দুইটি প্রধান অংশ,—**মাথা** ও **দেহকাণ্ড**। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ-এর লেজ নাই। ইহার ঘাড় বলিয়া কিছু নাই ; মস্তক ও দেহকাণ্ডের সংযোগস্থলে সামান্য একটু খাঁজ আছে।

মস্তক : কুনো ব্যাঙ-এর মাথা দেখিতে অনেকটা ত্রিভুজের মত হইলেও ইহার অগ্রভাগ অর্ধবৃত্তাকার। ইহাদের মুখ মস্তকের সম্মুখভাগে অবস্থিত। ইহাদের মুখের উপরে ও নীচে চোয়াল থাকিলেও সেই চোয়ালে দাঁত নাই। কুনো ব্যাঙের জিহ্বার গঠনও কোলা ব্যাঙের জিহ্বার ন্যায়। ইহারাও কোলা ব্যাঙের মতই জিহ্বা উল্টাইয়া পোকামাকড় ধরে।

ইহাদের মস্তকের সম্মুখভাগে, দুই পাশে দুইটি ছোট ছোট ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দুইটি উহাদের নাসারন্ধ্র। এই নাসারন্ধ্র দুইটি মুখবিবরের সহিত সংযুক্ত। কুনো ব্যাঙ-এর মস্তকের পিছনের দিকে দুইধারে দুইটি বেশ বড় বড় চক্ষু আছে। প্রত্যেক চক্ষুতে উপরের ও নীচের পল্লব আছে। এই নীচের পল্লবের সহিত সংযুক্ত একটি স্বচ্ছ পর্দার ন্যায় উপপল্লব আছে। ইহাদের চক্ষুর পশ্চাতে দুইটি গোলাকার সাদা পর্দা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্দা দুইটি ইহাদের কর্ণপটহ।

দেহকাণ্ড : কুনো ব্যাঙ-এর মস্তকের তুলনায় দেহকাণ্ড অনেক বড় ও মাংসল। দেহকাণ্ডের সম্মুখে পিঠের দুইধারে দুইটি লম্বা মাংসপিণ্ড আছে। এই মাংসপিণ্ডগুলিকে **প্যারটিড গ্রন্থি** বলে। কুনো ব্যাঙ-এর দুই জোড়া পা আছে। সম্মুখের পা দুইটির নাম **অগ্রপদ** এবং পশ্চাতের পা দুইটির নাম **পশ্চাৎপদ**। অগ্রপদ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ দুইটি বড়। প্রত্যেক অগ্রপদে চারিটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল আছে। ইহাদের আঙ্গুলগুলি গোড়ার দিকে পরস্পরের সহিত পর্দার দ্বারা সংযুক্ত। এইজন্য কুনো ব্যাঙ হাঁসের মত জলে সাঁতার কাটিতে পারে। মাটিতে

চলিবার সময় ইহারা পশ্চাৎপদের গোড়ালি ও পদতলের উপর ভর দিয়া থপ্‌থপ্‌ করিয়া লাফাইয়া চলে।

কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ-এর তুলনা

কোলা ব্যাঙ	কুনো ব্যাঙ
1. আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।	1. আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট।
2. দেখিতে সুন্দর।	2. দেখিতে কুৎসিত।
3. দেহের রং পিঠের দিকে সবুজের উপর সাদা ডোরাকাটা কিন্তু পেটের দিকের রং হালকা হলুদ।	3. দেহের রং পিঠের দিকে কালচে ধূসর কিন্তু পেটের দিকে হালকা ছাই রং বা সামান্য হলুদ।
4. গায়ের চামড়া মসৃণ এবং দেহে ওয়ার্ট নাই।	4. গায়ের চামড়া খুব খসখসে এবং অসংখ্য ওয়ার্ট দ্বারা আবৃত।
5. চক্ষুর পিছনে প্যারটিড গ্রন্থি নাই।	5. চক্ষুর পিছনে প্যারটিড গ্রন্থি আছে।
6. মস্তকের অগ্রভাগ অর্ধ-বৃত্তাকার নহে,—সূচালো।	6. মস্তকের অগ্রভাগ অর্ধ-বৃত্তাকার।
7. মুখবিবরের উপরের চোয়ালে এক পাটি দাঁত আছে।	7. মুখবিবরের কোন চোয়ালেই দাঁত নাই।
8. পিঠে কুঁজ আছে।	8. পিঠে কুঁজ নাই।
9. পা'গুলি বেশী লম্বা।	9. পা'গুলি বেশী লম্বা নহে।
10. অনেকদূর পর্যন্ত লাফাইতে পারে।	10. জোরে লাফাইতে পারে না।
11. পিছনের পায়ের আঙ্গুলগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পর্দা দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।	11. পিছনের পায়ের আঙ্গুলগুলি কেবলমাত্র গোড়ার দিকে পাতলা পর্দা দ্বারা সংযুক্ত।
12. ভাল সাঁতার কাটিতে পারে।	12. মোটামুটি সাঁতার জানে।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্ন : Essay Type

1. কোলা ব্যাঙ কাহাকে বলে? উহার আকৃতি বর্ণনা কর।
2. কুনো ব্যাঙ কাহাকে বলে? উহার আকৃতি বর্ণনা কর।
3. কুনো ব্যাঙ-এর দেহকাণ্ড বর্ণনা কর।
4. কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ-এর তুলনা কর।
5. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

   ব্যাঙের জিহ্বা, প্যারটিড গ্রন্থি, ব্যাঙের চক্ষু।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type

1. নিম্নের বাক্যগুলির শূন্যস্থান উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া পূর্ণ কর :

   (*a*) কোলা ব্যাঙের চক্ষুর পিছনে —— গ্রন্থি আছে।

   (*b*) —— ব্যাঙ —— ব্যাঙের মত কদাকার নহে।

   (*c*) —— ব্যাঙ ঘরের কোণায় এবং —— ব্যাঙ জলাভূমিতে বাস করে।

   (*d*) ব্যাঙের অগ্রপদে —— টি এবং পশ্চাৎপদে —— টি করিয়া আঙ্গুল আছে।

   (*e*) —— ব্যাঙের চামড়া খসখসে ; কিন্তু —— ব্যাঙের চামড়া মসৃণ।

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটির পাশে √ এই চিহ্ন বসাও :

   (*a*) ব্যাঙ কোন্ জাতীয় প্রাণী? (i) স্থলচর। (ii) জলচর। (iii) উভচর।

   (*b*) ব্যাঙের জিহ্বা কি প্রকার? (i) পিছনের দিকে আলগা। (ii) সম্মুখের দিকে আলগা।

(c) ব্যাঙের দেহ কিরূপ ? (i) পশুর ন্যায় লোমে আবৃত।
(ii) পাখীর ন্যায় পালকে আবৃত।
(iii) মাছের ন্যায় আঁশে আবৃত।
(iv) লোম, পালক বা আঁশহীন।

3. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কয়েকটি ভুল, কয়েকটি শুদ্ধ; যেগুলি শুদ্ধ সেইগুলির পাশে √ এই চিহ্ন এবং যেগুলি ভুল সেইগুলির পাশে × এই চিহ্ন দাও:

(i) কোলা ব্যাঙ কুনো ব্যাঙ অপেক্ষা ভাল সাঁতারু।
(ii) কুনো ব্যাঙের দাঁত নাই।
(iii) ব্যাঙের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ সমান।
(iv) কোলা ব্যাঙের গায়ের চামড়া খুব মসৃণ।
(v) কুনো ব্যাঙ জোরে লাফাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং রোগনিয়ন্ত্রণ (SAFETY, FIRST-AID AND CONTROL OF DISEASES)

প্রথম পাঠ

1. নিরাপত্তার নিয়মকানুন পালন করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন —সতর্কতা অবলম্বন প্রতি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য (Setting an example by practising safety-precaution is an important duty of every citizen):

মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নানাপ্রকার বিপজ্জনক দ্রব্য লইয়া কারবার করিতে হয়। অগ্নি, বিদ্যুৎ, নানাপ্রকার কীটঘ্ন ঔষধ, নানাপ্রকার রোগজীবাণুনাশক ঔষধ প্রভৃতি আমাদের প্রভূত উপকার করিলেও এইগুলি ব্যবহার করিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইহারা আমাদের অশেষ প্রকার উপকার করিলেও অসাবধানতার সহিত এই সকল জিনিস লইয়া কাজ করিলে ইহাদের হাতেই আমাদের প্রাণসংহার হইতে পারে।

অগ্নি (Fire): কথায় বলে, "আগুন লইয়া খেলা করিতে নাই।" রন্ধন প্রভৃতি নানাজাতীয় গৃহকর্মে আমরা সর্বদা আগুন ব্যবহার করি। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালাইয়া ঘরের অন্ধকার দূর করি। পূজা-পার্বণে আগুনের সাহায্যে নানাপ্রকার বাজি পোড়াই। আগুন লইয়া কাজ করিবার সময় জামা-কাপড় প্রভৃতি গুটাইয়া সতর্কভাবে কাজ করিতে হয়—যাহাতে জামাকাপড়ে আগুন না লাগিয়া যায়।



চিত্র 45. জামাকাপড় গুটাইয়া প্রদীপ জ্বালাইতেছে।

পেট্রোল, স্পিরিট প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থগুলি আগুন হইতে সর্বদা দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়। আগুনের কাজ শেষ হইয়া গেলেই উহা নিভাইয়া ফেলা উচিত।

সিনেমা-হলে, কলকারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা উচিত। বাড়ীতেও ঐরূপ যন্ত্র রাখিতে পারিলে ভাল হয়। তবে যাহাদের উহা রাখিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা কয়েকটি বড় বড় বালতি, কলসী প্রভৃতি অবশ্যই রাখিবে, যেন কোথাও আগুন লাগিলে উহাদের সাহায্যে সেখানে জল ঢালিতে পারে।



চিত্র 46. অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র

বিদ্যুৎ (Electricity) ঃ

শহরাঞ্চলে এবং অনেক গ্রামেও বর্তমানে বিদ্যুৎ আমাদের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। বিদ্যুৎ দ্বারা আমরা আলো জ্বালাই, পাখা চালাই, রেডিও চালাই। বৈদ্যুতিক ইস্তিরি, হিটার প্রভৃতিও অনেকে ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ আমাদের অশেষবিধ উপকার করিলেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং বিদ্যুৎ লইয়া কারবার করিতেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বাড়ীর বৈদ্যুতিক তারগুলি মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ বর্ষার পূর্বে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। বৈদ্যুতিক তারে ছেঁড়া-কাটা (leak) প্রভৃতি থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করা কর্তব্য। বিদ্যুৎ লইয়া কাজ করিতে



চিত্র 47. রবারের জুতা পরিয়া পাখা সারাইতেছে।

হইলে পরিধেয় জামাকাপড় গুটাইয়া লইয়া কাজ করিতে হয়। এইজন্য সর্বদা রবারের জুতা ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিদ্যুতের তার ধরিবার প্রয়োজন হইলে কাঠের উপর দাঁড়াইয়া লইতে হয়। ইহাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

কীটঘ্ন ও রোগজীবাণুনাশক ঔষধ (Insecticides and pest-killers): ছারপোকা, মাছি, মশা, পিঁপড়া প্রভৃতি মারিবার জন্য আমরা সর্বদা নানাপ্রকার কীটঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই সকল ঔষধ হাত দিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। কীটঘ্ন ঔষধ-সমূহ একপ্রকার বিষ। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারের পর হাত-পা, এমন কি হাতা-চামচ পর্যন্ত সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলা কর্তব্য। আয়োডিন, বেঞ্জিন প্রভৃতি রোগজীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করিবার পরও সাবান দিয়া হাত-মুখ ধোওয়া উচিত।

দৃষ্টান্ত স্থাপন (Setting an example): অগ্নি, বিদ্যুৎ, কীটঘ্ন ও রোগজীবাণুনাশক ঔষধাদি ব্যবহার করিবার সময় নিজের যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, অপরকেও তদ্রূপ করিতে উৎসাহিত করা উচিত। বাড়ীর ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে বাল্যকালেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাস গঠন করিতে সাহায্য করা উচিত। অশিক্ষিত পাড়াপ্রতিবেশীকেও এই সকল বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কথায় বলে, "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।" এই সকল নিয়নকানুন নিজে পালন করিয়াই অপরকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

কেবল ব্যক্তিশিক্ষাতেই কোন কাজ হয় না, কারণ সমাজের অল্প কয়েকজন মাত্র শিক্ষালাভ করিয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে যে মঙ্গলজনক নীতি পালনের সঙ্কল্প করিবে, তাহাতে অধিকাংশের সমর্থন ও সহানুভূতি না থাকিলে তাহা কখনও কার্যকরী হইতে পারে না। জন-সাধারণের মধ্যে এই সকল শিক্ষা-প্রচারের দুই প্রকার উপায় আছে।

(i) প্রত্যক্ষ সাফল্য দেখাইয়া। যেখানেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে সেখানেই গিয়া উহাদের প্রতিরোধের উপযোগী ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা সকলকে দেখাইয়া দিতে হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ করিলে লোকের মনে আপনা হইতেই বিশ্বাস জন্মিবে।

(ii) হাটে, বাজারে ও গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী প্রচার করিয়া। পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি আহ্বান করিয়া, ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা উহাদের প্রতিবিধান সম্পর্কে নানা-প্রকার ছবি দেখাইয়া এবং সেই সঙ্গে সরল বক্তৃতা দ্বারা সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া।

আধুনিক জগতের প্রায় প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই এখন এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। এই নবচেতনা অনুযায়ী প্রত্যেক জাতিই বুঝিয়াছে যে এই সকল দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা জাতির জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

দ্বিতীয় পাঠ

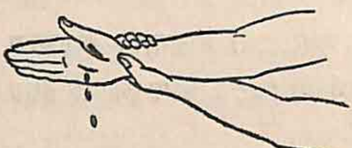
2. কাটা ও অগ্নিদাহের প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid for cuts and burns):

আকস্মিক দুর্ঘটনা (Accidents): অগ্নিদাহ, আঘাত লাগা, কাটিয়া যাওয়া প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসকের উপর নির্ভর না করিয়া, প্রথম কি করা দরকার সেই বিষয়ে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান না থাকার জন্য আমরা অনেক সময় অসহায়ভাবে ছুটাছুটি করি। ফলে সামান্য ক্ষত সময়ে সময়ে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় এবং গুরুতর আঘাতে সময়মত প্রাথমিক চিকিৎসা না হওয়ায়, পরে অভিজ্ঞ

চিকিৎসকের সুচিকিৎসায়ও কোন ফল পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর এই সকল কারণে বহু মূল্যবান জীবন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং আমাদের সকলের বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এখানে কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বলা হইতেছে।

কাটা (Cuts) ঃ আমাদের শরীরের কোন স্থান ধারাল অস্ত্রে বা অন্য কোন প্রকারে কাটিয়া গেলে, কোন স্থান কঠিন বস্তুর ঘর্ষণে, কোন কঠিন বস্তুর উপর পড়িয়া গেলে, কিংবা কাঁটা বা পেরেক ফুটিলে শরীরে ক্ষত উৎপন্ন হয়।



চিত্র 48. হঠাৎ কাটিয়া যাওয়ায় ক্ষত-স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ হইতেছে।

অনেক সময় এই সকল ক্ষত সামান্য ঔষধপ্রয়োগে বা বিনা ঔষধেই সারিয়া যায়। আবার অনেক সময় এই ক্ষত দিয়া নানাপ্রকার রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই ক্ষত উৎপন্ন হইলে আমাদের সকলেরই নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

(i) সামান্য ক্ষত হইলে উহা স্পিরিট দিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া টিংচার আয়োডিন-সিক্ত তুলা লাগাইবে। ক্ষতস্থানে জল লাগাইবে না।

(ii) ক্ষতস্থান হইতে ফিনকি দিয়া রক্তমোক্ষণ হইলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া টিংচার আয়োডিন-সিক্ত তুলা দিয়া জোরে চাপিয়া রাখিবে এবং চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। যদি ধমনী কাটিয়া যায়, তবে ক্ষতের উপরের দিকে, আর যদি শিরা কাটিয়া যায়, তবে ক্ষতের নীচের দিকে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

(iii) ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার জন্য বরিক তুলা বা পরিষ্কার

ন্যাকড়া জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া রোগজীবাণুশূন্য করিয়া লওয়া উচিত।

(iv) পল্লীগ্রামে ক্ষতস্থানে দূর্বাঘাস ছেঁচিয়া বা গাঁদাফুলের পাতার রস দেওয়ার প্রথা আছে। কিন্তু এই সকল জিনিস ক্ষতস্থানে দেওয়ার পূর্বে এইগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

অগ্নিদাহ (Burns) : অগ্নির সাক্ষাৎ স্পর্শে দগ্ধ হইলে তাহাকে **অগ্নিদাহ** বলে। উত্তপ্ত বাষ্প, ফুটন্ত জল, ফুটন্ত দুগ্ধ বা তৈল, ভাতের গরম ফেন ইত্যাদি পড়িয়া শরীরের কোন স্থান দগ্ধ হইলে তাহাকে **ঝলসান** বলে।

অগ্নিদাহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করা উচিত :—

(i) তোমরা জান যে, কোন জিনিস বায়ু (অক্সিজেন) ছাড়া



চিত্র 49. অগ্নিদাহ হইতে সতর্কতা

জ্বলিতে পারে না। সুতরাং বস্ত্রাদি ও অন্য জিনিসে আগুন লাগিলে বায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করিবার জন্যই উহাদের উপর কম্বল, কাঁথা, সতরঞ্চি প্রভৃতি চাপা দিতে হয়। এইগুলি জ্বলিবার

পূর্বে বায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হইয়া আগুন নিভিয়া যায়। পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াও উপকার পাওয়া যায়।

(ii) বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে কখনও ছুটাছুটি করিবে না; কারণ ইহাতে বায়ুর সংস্পর্শে আগুন অধিক জ্বলিয়া উঠে।

(iii) আগুন নিভিয়া গেলেই রোগীকে শোয়াইয়া দিবে। তৎপরে অতি সাবধানে দগ্ধ স্থানের বস্ত্রাদি অপসারণ এবং ক্ষতে কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে বিশুদ্ধ তুলা দিয়া তাহা পরিষ্কার করিবে। যদি কোন স্থানে বস্ত্র শরীরের সহিত আঁটিয়া যায়, তবে তাহা টানিয়া খুলিবার চেষ্টা না করিয়া কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিবে।

(iv) দগ্ধ বা ঝলসান স্থানে কখনও জল দিবে না। জল দিলে জ্বালা বৃদ্ধি হয়। ফোস্কা পড়িলে কখনও উহা গালিয়া দিবে না।

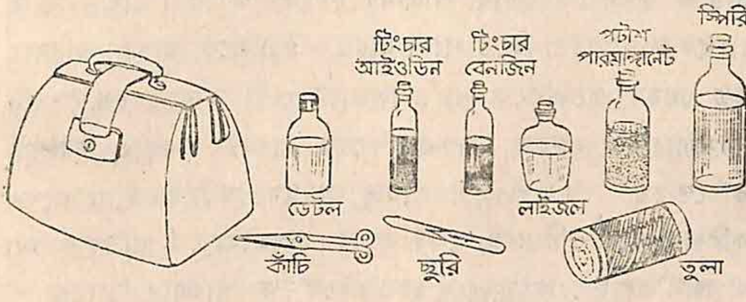
(v) কোন ক্ষতই বায়ুর সংস্পর্শে রাখিবে না। ইহাতে ক্ষত-স্থানের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষত দূষিত হয়।

(vi) ক্ষতস্থানে বিশুদ্ধ এরারুট-চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া বা অলিভ অয়েল (olive oil) কিংবা নারিকেল তৈলসিক্ত ন্যাকড়া বা তূলা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। ন্যাকড়া সিক্ত করিবার জন্য অলিভ অয়েল ও চুনের জল মিশ্রণ কিংবা একভাগ কার্বলিক এসিড ও পনের ভাগ অলিভ অয়েল মিশ্রণ কিংবা পোড়া গব্যঘৃত ও ক্যান্থারিন-মিশ্রণ ব্যবহার করা যায়।

(vii) ঝলসান জায়গায় আলুবাটা, কলা-চটকান, কস্টিক লোশন, সুরাসার বা চুনের জল ও নারিকেল তৈলের মিশ্রণ বা ডিমের সাদা অংশ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষত শীঘ্রই সারিয়া যায়। আজকাল বার্নল (Burnol) নামক ঔষধও অনেক সময় প্রয়োগ করা হয়।

(viii) অগ্নিদাহ সাংঘাতিক হইলে অবিলম্বে ডাক্তারের সাহায্য লওয়া অবশ্য কর্তব্য।

প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধপত্র (First Aid) : প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে, বিশেষতঃ যাহাদের বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের বাড়ীতে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাহাদের হাতের



চিত্র 50. প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ ও যন্ত্রপাতি

কাছে সর্বদা কিছু ঔষধপত্র রাখা কর্তব্য। এই সকল ঔষধপত্র পৃথক একটি ব্যাগে রাখা উচিত। এই সকল ঔষধপত্রের মধ্যে কিছু তূলা, কিছু ব্যাণ্ডেজের কাপড়, ন্যাকড়া, ডেটল, টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, পটাস পারমাঙ্গানেট, কিছু স্পিরিট, একটি ছুরি, একটি কাঁচি, বার্নল ইত্যাদি অবশ্যই রাখা উচিত।

তৃতীয় পাঠ

3. প্রতিরোধযোগ্য সাধারণ রোগ (Common preventible diseases) :

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'Prevention is better than cure.'—কথাটির অর্থ হইতেছে এই যে, রোগকে প্রতিরোধ করা, রোগ নিরাময় অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ইহা শুধু ব্যক্তিস্বাস্থ্যের কথা নহে ;—ইহা বিশেষ করিয়া গণস্বাস্থ্যের অন্তর্গত কথা। যে সকল ব্যাধি সংক্রামক, অর্থাৎ যাহা একজন হইতে অনেকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে (epidemic), এক দেশ হইতে অন্য দেশে

ছড়াইয়া পড়ে (pandemic), সেই সকল ব্যাধিকে একটু চেষ্টা করিলেই নিবারণ করা যায়। এই সকল সংক্রামক ব্যাধিকে **নিবার্য বা প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধি** (preventible diseases) বলে। চেষ্টা করিলে জনগণকে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়,—উহার ব্যাপকতা থামাইয়া দিতে পারা যায়। ঐগুলিকে নিবারণ করিবার জন্য যেমন প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিতে হয়, তেমনি সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যও কয়েক প্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হয়। যে সকল রোগজীবাণু আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে, সেই সকল রোগজীবাণুকে প্রতিহত করা বা ধ্বংস করাই রোগাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।

পচন-নিবারক ঔষধ (Antiseptics) : যে সকল ঔষধ বা দ্রব্য শরীরের ক্ষতস্থানের পচন নিবারণ করে, উহাদিগকে **পচন-নিবারক ঔষধ** (Antiseptics) বলে। **লিস্টার** (1827—1912) নামে ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পচন-নিবারক প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্বে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক **লুই পাস্তুর** আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, বাতাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণায় নানারকম অতি সূক্ষ্ম ক্ষতিকর জীবাণু আছে। এই সকল জীবাণু এত ছোট যে খালিচোখে উহাদিগকে দেখা যায় না। কেবলমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যেই উহাদিগকে দেখা যাইতে পারে। বাতাসের এই সূক্ষ্ম জীবাণুগুলিই আমাদের শরীরের ক্ষতস্থানে পচন সৃষ্টি করে। বাতাস হইতে অথবা অস্ত্রচিকিৎসকের হাত হইতে অথবা তাঁহার ব্যবহৃত যন্ত্রাদি হইতে এই সূক্ষ্ম জীবাণুগুলি ক্ষতে বাসা বাঁধে ও উহাতে পচন সৃষ্টি করে। যে সকল ঔষধ এই সকল সূক্ষ্ম জীবাণুগুলিকে পঙ্গু ও নিস্তেজ করে, উহাদিগকেই **পচন-নিবারক ঔষধ** বলে। কার্বলিক এসিড, টিংচার আয়োডিন, ডেটল, স্পিরিট প্রভৃতি পচন-নিবারক ঔষধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাহারও শরীরে কোন স্থান কাটিয়া গেলে আমরা ঐ স্থানে টিংচার আয়োডিন, বেঞ্জিন বা ডেটল প্রভৃতি সিক্ত তুলা লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখি। ইহার ফলে বাতাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুগুলি আর ঐ ক্ষতস্থানের ক্ষতি করিতে পারে না ; আয়োডিন প্রভৃতি ঔষধের সংস্পর্শে আসিয়া উহারা পঙ্গু ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে ধীরে ধীরে ঐ ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি ঐ ক্ষত-স্থানে কোন সূক্ষ্ম জীবাণু বাসা বাঁধিতে পারে, তবে ঐ ক্ষতস্থান ধীরে ধীরে পাকিয়া উঠে ও উহাতে পচন ধরে।

পরীক্ষা 1. দুইটি কাচের গ্লাস লও। উহাদের একটিতে কিছু স্পিরিট এবং অপরটিতে কিছু জল লও। এখন প্রত্যেকটি গ্লাসে একটি করিয়া আলু ডুবাইয়া রাখ। বেশ কিছুদিন পরে দেখিবে, যে গ্লাসে জল আছে, সেই গ্লাসের আলু পচিয়া গিয়াছে ; কিন্তু যে গ্লাসে স্পিরিট আছে, সেই গ্লাসের আলু পচে নাই।

ইহার কারণ কি ? জলে যে সমস্ত জীবাণু আছে উহারা আলুটিকে পচাইয়া দিয়াছে ; কিন্তু বাতাসের জীবাণু স্পিরিটের সংস্পর্শে আসিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য ঐ গ্লাসের আলু পচে নাই।

পরীক্ষা 2. দুইটি ছোট ছোট বেগুন লও। উহাদের একটি টেবিলের উপর একটি খোলা পাত্রে রাখ। অপরটি ডেটল-ভিজান তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া অন্য একটি খোলা পাত্রে রাখ। ঘণ্টা পাঁচ ছয় পর পর ডেটল-ভিজান তুলা শুকাইয়া গেলে উহা আবার ডেটল দিয়া ভিজাইয়া দাও। এইভাবে বেগুন দুইটি কয়েকদিন রাখিয়া দিলে দেখিবে, ডেটল-ভিজান তুলা দ্বারা আবৃত বেগুনটি পচে নাই ; কিন্তু অন্যটি পচিয়া গিয়াছে।

ইহার কারণ কি ? বাতাসের জীবাণু একটি বেগুনকে পচাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ডেটল-ভিজান তুলার সংস্পর্শে আসিয়া উহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে ; এইজন্য ঐ বেগুনটি পচে নাই।

নির্বীজন (Disinfection)ঃ 'নির্বীজন' কথাটির অর্থ হইতেছে—জীবাণুদের ধ্বংসসাধন। সংক্রামক রোগ মাত্রেরই জীবাণু থাকে। সেই জীবাণু বাঁচিয়া থাকিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার রোগ হয়। রোগীর মলমূত্র, কফ-থুতু, এমন কি তাহার ব্যবহৃত সকল জিনিসে এই সকল জীবাণু অগণিত সংখ্যায় বিদ্যমান থাকে। এই জীবাণুগুলিকে দেখা না গেলেও নির্বীজনের নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা উহারা সমস্তই বিনষ্ট হয় এবং উহার ফলে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়। অতএব রোগ-নিবারণের জন্য নির্বীজনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

নির্বীজকের শ্রেণীবিভাগ (Kinds of disinfectants)ঃ নির্বীজক নানা প্রকার হইতে পারে। ইহারা মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত ; যথা, (i) প্রাকৃতিক নির্বীজক, (ii) ভৌতিক নির্বীজক ও (iii) রাসায়নিক নির্বীজক।

(i) **প্রাকৃতিক** (Natural) **নির্বীজক**ঃ রৌদ্র, বায়ু প্রভৃতি স্বাভাবিক নির্বীজক। রৌদ্রতাপে অনেক রোগজীবাণু অতি অল্পকালের মধ্যে ধ্বংস হয়। এইজন্যই রোগীর বিছানা ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

(ii) **ভৌতিক** (Physical) **নির্বীজক**ঃ অগ্নিতাপ রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি গরম জলে সিদ্ধ করিলে উহা জীবাণুমুক্ত হয়। কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগীর মলমূত্র আগুনে পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(iii) **রাসায়নিক** (Chemical) **নির্বীজক**ঃ তীব্র রাসায়নিক বীজঘ্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়াও সকল প্রকার জীবাণুকে ধ্বংস করা যায়। নিম্নে কতকগুলি রাসায়নিক নির্বীজকের পরিচয় দেওয়া হইল।

(*a*) **চুন**—টাটকা চুন অতি উত্তম নির্বীজক। টাটকা চুন জলে গুলিয়া নর্দমা কিংবা পায়খানায় ঢালিয়া দিলে জীবাণুও মরে,

দুর্গন্ধও দূর হয়। আমরা যে মধ্যে মধ্যে বাড়ীঘর চুনকাম করি, তাহা সৌন্দর্যের দিক দিয়া তো বটেই, স্বাস্থ্যের পক্ষেও একটি উত্তম ব্যবস্থা। নির্বীজক ব্লিচিং পাউডারের মধ্যেও চুন আছে।

(*b*) **ক্লোরিন**—ব্লিচিং পাউডার জলে মিশাইয়া তাহার মধ্যে সামান্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালিয়া দিলেই ক্লোরিন গ্যাস উত্থিত হয়। ইহা একটি উত্তম জীবাণুনাশক। ইহা দ্বারা দুর্গন্ধও দূর হয়।

(*c*) **ফর্মালিন গ্যাস**—ফর্মালিন নামক একপ্রকার বীজঘ্ন ঔষধ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে উহা হইতে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসের ঝাঁজে নানাপ্রকার রোগ-জীবাণু, এমন কি যক্ষ্মা-জীবাণু পর্যন্ত বিনষ্ট হয়।

(*d*) **কার্বলিক এসিড**—ইহা আলকাতরা হইতে প্রস্তুত উত্তম একটি জীবাণুনাশক পদার্থ। ইহার দামও সস্তা। ইহা হইতে প্রস্তুত কার্বলিক সাবান মাখিয়া স্নান করিলে খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগের জীবাণু বিনষ্ট হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত ফিনাইল (Phenyle), আইজল (Izol) প্রভৃতিও জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়। শহরের হাসপাতালসমূহে রোগীদের মল-মূত্র-বমি ইত্যাদি ফিনাইল, আইজল প্রভৃতি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়। অনেক গৃহস্থও এই সকল জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে।

(*e*) **পটাস পারমাঙ্গানেট**—ইহা একপ্রকার লালবর্ণের গুঁড়া পদার্থ। ইহা সামান্যমাত্র জলে ফেলিলে ঐ জল লাল হইয়া যায়। ইহা হইতে তখন প্রচুর অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয় এবং এইজন্য ইহা বীজঘ্ন ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাইওরিয়া, সান্নিক প্রভৃতি দন্তরোগে কুলকুচির জন্য পটাস পারমাঙ্গানেট-মিশ্রিত জলের বহুল প্রচলন আছে।

(*f*) **অন্যান্য নির্বীজক**—সাবানও এক হিসাবে ভাল নির্বীজক। ইহা ছাড়া, বর্তমানে **ডেটল** (Detol), **স্যাভলন** (Savlon),

ক্রাইজল (Crizol) প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট নির্বীজক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা এখনও প্রত্যূষে বাড়ীঘর, উঠান প্রভৃতি গোবর দিয়া লেপিয়া থাকে ও বাড়ীর আনাচে-কানাচে গোবর ছড়া দিয়া থাকে। টাটকা গোবর একটি ভাল জীবাণুনাশক হিসাবে এই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামে পাড়ায় বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে এখনও অনেকে বাড়ীতে গন্ধক পোড়াইয়া থাকে। গন্ধক পুড়িয়া যে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা বহু রোগজীবাণু ধ্বংস করে। ইহা ছাড়া আমরা যে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ধূপ-ধূনা পোড়াই, উহার ধোঁয়াও অনেক রোগজীবাণু ধ্বংস করে।

অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা (Immunisation) : আমাদের সকলের শরীরেই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা আছে। ইহাকে স্বাভাবিক **অনাক্রম্যতা** (natural immunity) বলা হয়। এইজন্যই সহসা কোনও সংক্রামক রোগ আমাদিগকে কাবু করিতে পারে না। কিন্তু রোগজীবাণুর ক্ষমতা যখন আমাদের এই ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী হয়, তখনই আমরা রোগে আক্রান্ত হই।

একবার কোন একটি বিশেষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াও যদি কেহ আরোগ্যলাভ করে, তবে ঐ রোগ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির অনাক্রম্যতা শক্তি পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এইজন্যই দেখা যায় যে, কাহারও একবার হাম বা বসন্ত হইলে তাহার আর পুনরায় হাম বা বসন্ত হয় না।

রোগপ্রতিরোধক ইঞ্জেকসন ও টিকা (Inoculation and Vaccination) : এই তথ্য হইতেই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে কৃত্রিম উপায়ে অতি সামান্য পরিমাণে যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহে কোন রোগের বীজ ঢুকাইয়া দেওয়া যায়, তবে

তাহাতেও ঐ ব্যক্তির দেহের মধ্যে ঐ বিশেষ রোগটির বিরুদ্ধে এইরূপ অনাক্রম্যতা-শক্তি অর্জিত হইবে। এই শক্তি স্থায়ীও হইতে পারে, আবার অস্থায়ীও হইতে পারে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধক ইঞ্জেকসন ও টিকা দিবার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে সকল প্রকার রোগের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে; বিশেষ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধেই এই প্রকার কৃত্রিম অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা করা যায়।

নিম্নে এইরূপ কয়েকটি রোগের কথা বর্ণিত হইল।

বসন্ত—বসন্ত দুই প্রকার,—(i) **আসল বসন্ত** (Small Pox) এবং (ii) **জলবসন্ত** (Chicken Pox)। ইহাদের মধ্যে আসল

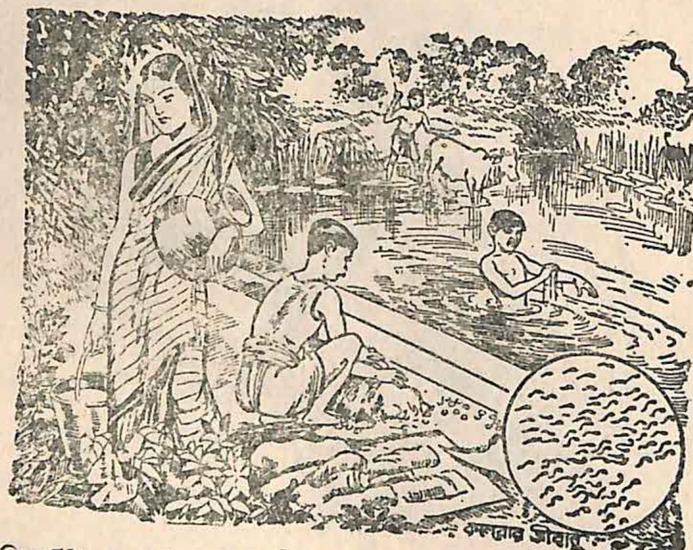


চিত্র 51. বসন্তরোগী

বসন্তের টিকাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, জলবসন্তের টিকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আসল বসন্ত খুবই মারাত্মক, জলবসন্ত তত মারাত্মক নহে। বসন্তের টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন **ডঃ জেনার**।

প্রতি বৎসর বসন্তের মৃদু শক্তিসম্পন্ন বীজ দ্বারা টিকা লইলে শরীরে যে অনাক্রম্যতা-শক্তি জন্মে, তাহার ফলেই আসল বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। **ভাইরাস্** (Virus) নামক এক প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু হইতেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। এই ভাইরাস্ বসন্তরোগীর শরীর হইতে বাতাসের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মায়। কিন্তু টিকা লইলে ইহারা শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ জন্মাইতে পারে না।

কলেরা—'কমা ভিব্‌রিও' নামক এক প্রকার জীবাণু হইতে এই রোগের সৃষ্টি হয়। খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এই জীবাণুগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগের মৃত জীবাণু



চিত্র 52. অজ্ঞতাবশতঃ পানীয় জলের পুষ্করিণীতে লোকে কলেরা রোগীর কাপড় কাচিতেছে এবং স্নান করিতেছে। এইরূপ পানীয় জলই কলেরা ছড়ায়।

ইঞ্জেকসনের মাধ্যমে কোন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঢুকাইয়া দিলে অন্ততঃ ছয় মাস পর্যন্ত তাহার দেহে অনাক্রম্যতা বজায় থাকে; সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে কলেরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

টাইফয়েড—ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক জ্বরও বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পেটের পীড়া, অর্থাৎ এই রোগের জীবাণু পেটের মধ্যে নাড়ী বা অন্ত্রে বাসা বাঁধিলেই এই রোগ হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে বাংলায় **আন্ত্রিক জ্বর** বলে। এই রোগ প্রতিরোধের জন্যও ইঞ্জেকসনের ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম টি. এ. বি. সি. (T. A. B. C.)। এই রোগের মৃত জীবাণু হইতে এই ইঞ্জেকসন প্রস্তুত হয়। টি. এ. বি. সি. কলেরা রোগেরও প্রতিরোধক। এই ইঞ্জেকসন লইলে দেহে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য অনাক্রম্যতা বজায় থাকে।

পরোক্ষ প্রতিরোধ (Indirect prevention) : কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ কি প্রকারে প্রতিরোধ করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রকার প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ (Direct prevention) বলিতে পারি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে সেগুলিকে ঐভাবে প্রতিরোধ করা যায় না, উহাদিগকে পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ (Indirect prevention) করিতে হয়।

এখানে কতিপয় রোগের পরোক্ষ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে।

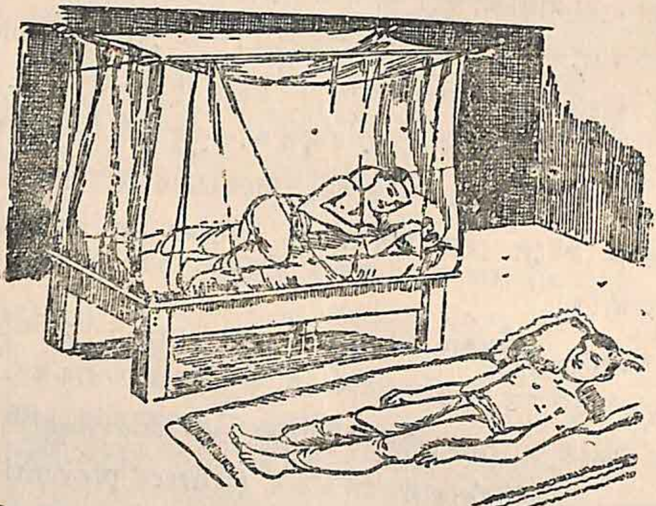
ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়া সংক্রামক রোগ নহে, অর্থাৎ ইহা স্পর্শ দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এনোফেলিস জাতীয় স্ত্রী-মশক এই রোগ বিস্তার করে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু রোগীর রক্ত ভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকে না। এনোফেলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান করিবার কালে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঐ মশার শরীরে প্রবেশ করে। যখন ঐ মশা কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন সুস্থ



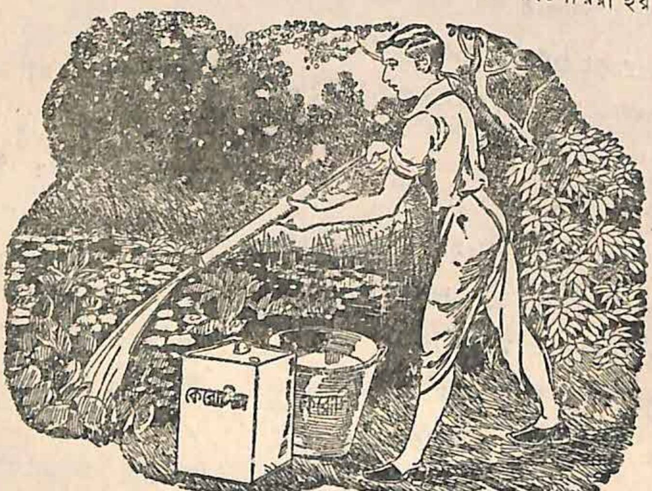
চিত্র 53. এনোফেলিস মশা

লোকের শরীরের রক্তে ঐ জীবাণু মিশিয়া যায় এবং তাহার ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

মশারির মধ্যে ঘুমাইলে মশা কামড়াইতে পারে না। সুতরাং



চিত্র 54. মশারি টাঙাইয়া শুইলে মশক-দংশন হইতে নিরাপদ হওয়া যায় এবং মশারি না টাঙাইয়া শুইলে মশক-দংশনে ম্যালেরিয়া হয়।



চিত্র 55. মশা-নিবারণের জন্য জলে কেরোসিন ছড়ান হইতেছে।

ইহাতে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত

মশা যে সকল খানা, ডোবা, গর্তে ডিম পাড়ে, তাহা ভরাট করিয়া দিতে হয়। ঐ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে জলে কেরোসিন তৈল, ডি. ডি. টি. বা গ্যামাক্সিন মিশাইয়া ছিটাইয়া দেওয়া উচিত। ঘরের দেওয়ালে ডি. ডি. টি. ছিটাইয়া দিলেও মশা মরিয়া যায়।

কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ।

আমাশয়—কলেরা ও টাইফয়েডের মত আমাশয় রোগও খাদ্য-পানীয়ের দ্বারা সংক্রামিত হয়। আমাশয় রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পুকুর বা নদীর জল পান করিবার পূর্বে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। নলকূপের জল অবশ্য ফুটাইয়া না খাইলেও চলে, তবে শহরে যে কলের জল সরবরাহ করা হয় তাহাও ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

মাছি আমাশয় রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনরূপ খাদ্যবস্তু কখনও অনাবৃত রাখা উচিত নহে এবং খাইবার সময়ও যাহাতে খাবারে মাছি না বসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ঘরে ডি. ডি. টি. ছিটাইয়া দিলে মাছি মরিয়া যায়। ফর্মালিন, পাইরিথ্রাম প্রভৃতিও মাছির পক্ষে বিষ। এইগুলি গুড় প্রভৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ঘরের স্থানে স্থানে রাখিলে তাহাতে মাছি বসিলেই মরিয়া যায়।

এমিটিন আমাশয়ের একটি উপকারী ঔষধ।

হাম—ইহা এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ইহা বসন্তের মতই এক প্রকার ব্যাধি, তবে খুবই মৃদু ধরনের। এই রোগ প্রতিরোধের কোন ঔষধ নাই। হামরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একটি স্বতন্ত্র ঘরে পৃথক করিয়া সর্বদা মশারির মধ্যে রাখিতে হয়। রোগীর শুশ্রূষাকারীকে সর্বদা ডেটল, ফিনাইল, কার্বলিক এসিড প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে জীবাণু-মুক্ত করিয়া অপরের সহিত মেলামেশা

করিতে হইবে। তাহাকে রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জামাকাপড় বদলাইতে হইবে।

মাছি হামরোগের সংক্রমণ ঘটাইতে সাহায্য করে; সুতরাং মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—ইহাও একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ইনফ্লুয়েঞ্জায় হাত, পা, মাথা প্রভৃতি অঙ্গে খুব বেদনা বোধ হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার সহিত জ্বরও হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হামরোগীর মত স্বতন্ত্র ঘরে অবস্থান করিতে হইবে। তবে ইহা হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী ও মারাত্মক নহে। দুই চারিদিন জ্বরে ভুগিবার পরেই ইনফ্লুয়েঞ্জা সারিয়া যায়; কিন্তু এই রোগে শরীর খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাল ভাল ঔষধ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

প্রশ্নাবলী

সাধারণ প্রশ্নাবলী : Essay Type

1. আকস্মিক দুর্ঘটনা কাহাকে বলে? কাহারও গায়ে আগুন লাগিয়া গেলে তুমি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

2. তোমার প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে তুমি কিজন্য কি কি ঔষধ ও যন্ত্রপাতি রাখিবে?

3. পচন-নিবারক ঔষধ কাহাকে বলে? নির্বীজক ঔষধ কাহাকে বলে? এই দুই প্রকার ঔষধের মধ্যে পার্থক্য কি?

4. নির্বীজকগুলি কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত? কয়েকটি রাসায়নিক নির্বীজকের নাম কর। গরমজল কি এক শ্রেণীর নির্বীজক?

5. অনাক্রম্যতা বলিতে কি বোঝ? অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা হিসাবে আমরা কি কি করিয়া থাকি?

6. কলেরা, বসন্ত ও টাইফয়েড রোগের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের কি কি করা উচিত?

7. পরোক্ষ প্রতিরোধ কাহাকে বলে? এমন একটি রোগের নাম কর যাহাকে আমরা পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ করিতে পারি। ঐ রোগটির প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হিসাবে তুমি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

8. টীকা লিখ:

টিকা, আমাশয়, নির্বীজন, কার্বলিক এসিড, প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ, চুন।

নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন: Objective Type

1. নিম্নে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হইল এবং উহাদের সমর্থনে একাধিক যুক্তি বা কারণ দেখানো হইল। উপযুক্ত কারণটির পার্শ্বে √ এই চিহ্ন দাও।

(i) দেহের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে—
- (*a*) দগ্ধস্থানে ঠাণ্ডা জল দিবে।
- (*b*) দগ্ধস্থানে বার্নল লাগাইবে।
- (*c*) দগ্ধস্থানে আয়োডিন দিবে।

(ii) জামাকাপড়ে আগুন লাগিলে—
- (*a*) ঠাণ্ডা জল ঢালিবে।
- (*b*) জ্বলন্ত কাপড় ছাড়াইয়া ফেলিবে।
- (*c*) কম্বল কিংবা কাঁথা চাপা দিবে।

(iii) টিকা লইলে—
- (*a*) বসন্ত রোগ হয় না।
- (*b*) কলেরা রোগ হয় না।
- (*c*) আমাশয় হয় না।

(iv) বিদ্যুতের তার ধরিবার প্রয়োজন হইলে—
- (*a*) মাটির উপর দাঁড়াইতে হয়।
- (*b*) কাঠের উপর দাঁড়াইতে হয়।
- (*c*) ইটের উপর দাঁড়াইতে হয়।

2. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(i) বিদ্যুৎ লইয়া কাজ করিতে হইলে —— জুতা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(ii) ধারাল ছুরিতে দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে ঐ স্থানে —— লাগাইবে।

(iii) পচন-নিবারণের ঔষধ আবিষ্কার করেন ——।

(iv) বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কার করেন ——।

3. **"হ্যাঁ"** বা **"না"** উত্তর দাও।

(*a*) কলেরা কি জলবাহিত রোগ? —

(*b*) টাইফয়েড কি বায়ুবাহিত রোগ? —

(*c*) পচন-নিবারক ঔষধগুলি কি জীবাণু ধ্বংস করে? —

(*d*) অগ্নি কি একটি ভৌতিক নির্বীজক? —

(*e*) গন্ধক কি জীবাণু ধ্বংস করে? —

4. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পার্শ্বে ✓ এই চিহ্ন এবং যেগুলি ভুল তাহাদের পার্শ্বে × এই চিহ্ন দাও:

(*a*) জেনার বায়ুতে জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

(*b*) বসন্তের টিকা লইলে জলবসন্ত ও আসল বসন্ত—কোনটাই হয় না।

(*c*) এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।

(*d*) জল ফুটাইয়া খাইলে হাম হয় না।

(*e*) পটাস পারম্যাঙ্গানেট একটি নির্বীজক ঔষধ।

(*f*) ব্লিচিং পাউডারে চুন ও ক্লোরিন আছে।

